আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

হজ্জ বিশেষ সংখ্যা

মাসিক ১৮৬
সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA
১৮৬ তম সংখ্যা আগস্ট-সেপ্টেম্বর'১৬
শাওয়াল-জিলহজ্জ ১৪৩৭ হিজরী

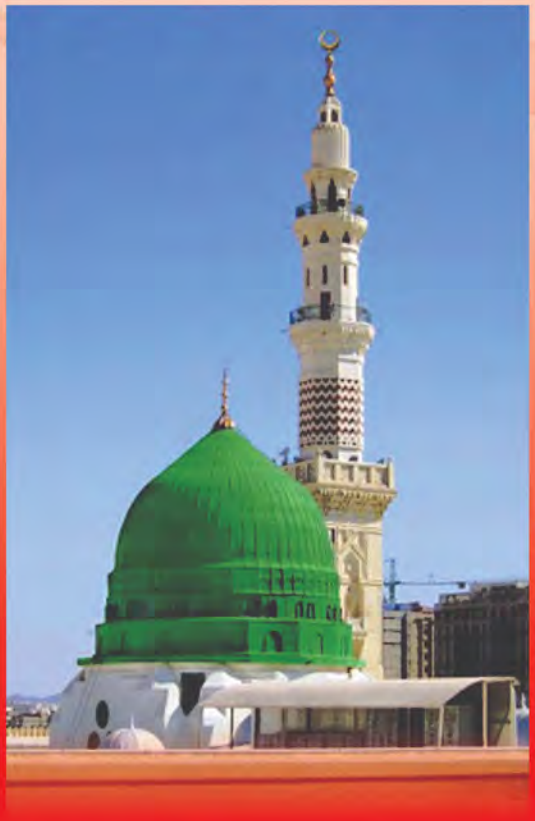

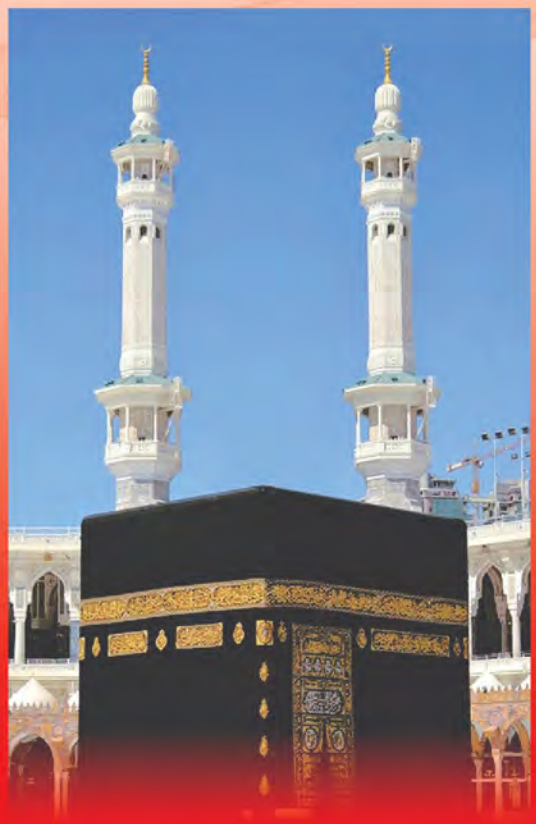

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)
E-mail :hafej_ma.jalil@yahoo.com. Website : www.sunnibarta.com

নং- জেপ্রদা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক
সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

হাদিয়া টা: ১৫.০০

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রাঃ)
এম.এম.এম.এ-বিসিএস

সম্পাদক
মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন
খতীব, গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল হাশেম
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।

ডঃ এ্যাডভোকেট আব্দুল আউয়াল
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।

নির্বাহী পরিচালক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রব
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।
যুগ্ম পরিচালক (অবঃ), বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

যোগাযোগের ঠিকানা
আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রব, মোবাইল: ০১৭২০৯০৬৯৯৬
আলহাজ্ব মোঃ শাহ আলম, মোবাইল : ০১৬৭০৮২৭৫৬৮
গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবসেনা, মোবাইল ঃ ০১৭১৬৫৭৩৩৩৩
সহযোগী ঃ মোঃ আবু তাহের, মোঃ ইয়াছিন আলী,
মোঃ আবু সাঈদ, মোঃ রফিকুল ইসলাম

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ

- অধ্যাপক আলহাজ্ব এম. এ. হাই
- ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
- আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহ আলম
- আলহাজ্ব এ্যাডঃ দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারী আশরাফী
- কাজী মাওঃ মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী
- মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন
- আলহাজ্ব মোঃ মজিবুর রহমান
- মোহাম্মদ হামিদুল হক শামীম (কাউন্সিলর)
- ফারুক আহমেদ আশরাফী
- এডভোকেট কামরুল হাসান খায়ের

সহযোগিতায়

- এ্যাডভোকেট শাহ ইলিয়াস রতন
- এ্যাডভোকেট মোঃ জালাল উদ্দিন
- আলহাজ্ব মোঃ জাকির হোসেন
- আলহাজ্ব আবু আজার ফকির
- সুলতান আহম্মেদ
- ইঞ্জিনিয়ার শাহ আলম বাদল
- আলহাজ্ব মোঃ শহিদুল্লাহ্
- আলহাজ্ব রশিদ আহম্মদ কাজল
- হাজী আলী হোসাইন জাহাঙ্গীর
- আলহাজ্ব আজিজুল হক চৌধুরী
- এ.কে.এম. হাবিব উল কুদ্দুস
- মোঃ শহীদুর রহমান
- মোঃ মফিজুর রহমান
- মোঃ খলিলুল্লাহ্
- কাজী নুরুল আফসার বিন্যুৎ
- মোঃ শরীফ
- সৈয়দ মোঃ নাঈম

প্রচারে ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, বাংলাদেশ
স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

বিজ্ঞাপনের হার ঃ পূর্ণ পৃষ্ঠা-৩০০০ (তিন হাজার) টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা-১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত টাকা), কোয়ার্টার পৃষ্ঠা-৭৫০ টাকা

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : hafez_ma.jalil@yahoo.com. Website: www.sunnibarta.com

সূচীপত্র

দরসে হাদিস : সামর্থ্যবানদের উপর কুরবানী ওয়াজিব ---------- ০৩

হাদিসের আলোকে : হজ্জ ও উমরার ফজিলত ---------- ০৫

হজ্জে বাইতুল্লাহর মুল পাঁচদিনের কার্যক্রম ---------- ০৭

যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারা সফর নাজাতের উসিলা ---------- ১৩

রাসুল (দঃ)-এর রওজা যিয়ারতের হাদিস নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তি নিরসন ---------- ১৬

সুন্নী আন্দোলনের কান্ডারী : সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহঃ) ---------- ২১

অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ জলিল (রঃ) ছিলেন আমাদের ঈমানী পথের দিশারী---------- ২৫

ইসলামের দৃষ্টিতে যৌতুক নেয়া হারাম---------- ২৭

প্রশ্নোত্তরে হজ্জ ও কুরবাণী---------- ২৯

চলে গেলেন সুন্নি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা আল্লামা ছদরুল আমিন রেজভী---------- ৩১

- যে আমার রওযা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব।
- যে ব্যক্তি আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো।
- যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার রওযা শরীফ জিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে।
- যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়া একমাত্র আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে আসবে কিয়ামতে তার জন্য আমি সুপারিশকারী হব।

সম্পাদকীয়

১৮ ভাদ্র ১৪২৩ ❖ ২৯ জিলক্বদ ১৪৩৭ ❖ ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৬

জঙ্গিবাদ নিপাত যাক

দেশ-জাতি আজ চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। জঙ্গিদের কয়েকটি নজিরবিহীন ঘটনায় উদ্বিগ্ন দেশের মানুষ। আজ জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসীরা কি ইসলামের শান্তির আদর্শ বিশ্বাস করে? সাহাবায়ে কেরাম মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কাছে জানতে চেয়েছিলেন, মুসলমান কে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আল্ মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি।" অর্থাৎ মুসলমান সে ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)। আজ এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে হত্যার উৎসবে মেতে উঠেছে। মূলতঃ ইসলামের আদর্শের জন্য নয়, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে জঙ্গিরা ব্যবহৃত হচ্ছে- কিন্তু তা তারা জানে না এবং যারা নিহত হচ্ছে তারাও জানে না কী কারণে নিহত হলো। জাতি আজ এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চায়। তবে এই ব্যাপারে বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে অভিভাবকবৃন্দ। মা-বাবা সচেতন হলে সন্তান কোন দিন পথভ্রষ্ট হতে পারে না, আমরা চাই বিপথগামীরা ফিরে আসুক স্বাভাবিক জীবনে।

হজ্জ- যিয়ারত- কুরবানি

একদিকে হজ্জ ও যিয়ারত - অন্যদিকে দুনিয়াব্যাপী কোরবানী উৎসবের আয়োজন। কোরবানীর উৎসব এজন্য যে, ঐদিন আল্লাহর পক্ষ হতে এটা যিয়াফত। নিজে খাও, অন্যকে বিলাও - এ হলো ইসলামী সাম্যের প্রকাশ উদাহরণ । বনের পশুকে কোরবানী করতে হলে মনের পশুত্বকে কোরবানী করতে হয় আগে। ইহাই কোরবানীর মূল শিক্ষা। আল্লাহপাক বলেন "কোরবানীর রক্ত মাংসে আমার প্রয়োজন নেই- বরং মনের তাকওয়া পৌঁছে আমার কাছে । তাই বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ্র রেযামন্দি অর্জনের নিয়তে কোরবানী করতে হয়। এটাকে কুরবানি বলা হয়।

দরসে হাদিস

সামর্থ্যবানদের উপর কুরবানী ওয়াজিব

- মুফতী মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا -

অনুবাদঃ- হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। (সূত্রঃ- ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে পশু যবেহ করার নাম কুরবানী। সামর্থ্যবানদের উপর কুরবানি ওয়াজিব। বস্তুত: মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম কুরবানি হযরত আদম আলায়হিস সালামের দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের কুরবানি। যেমন ইরশাদ হয়েছে -

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ -

অর্থাৎ, আদমের দুই সন্তানের বৃত্তান্ত আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনান, যখন তারা উভয়ে কুরবানি করেছিল তখন একজনের কুরবানি কবুল হল এবং অন্যজনের কবুল হল না। (সূরা মায়েদা, আয়াত-২৭)

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য প্রিয়বস্তু উৎসর্গ করার নামই কুরবানি। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় হযরত ইব্রাহিম আলায়হিস সালাম প্রভুর প্রেমে সারাজীবন সাধনায় লিপ্ত ছিলেন আর কঠিন কঠিন অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হন। চরম ধৈর্য আর প্রেমের মাধ্যমে সফলভাবে উত্তীর্ণ হন। বর্ণিত আছে - একদিন তিনি আল্লাহ্‌র মুহব্বতে একশত উট, এক হাজার গরু এবং দশ হাজার বকরি কুরবানি করেন- এতে মানুষতো বটে ফেরেশতারাও আশ্চর্যান্বিত হন। তখনই হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম আবেগাপ্লুত হয়ে বলে ফেললেন আমার রবের প্রেমে যা করেছি তা নিতান্তই অপ্রতুল। বরং আমার যদি একটা সন্তান থাকত প্রয়োজনে আমার সে সন্তানকে কুরবানি দিতেও দ্বিধাবোধ করতাম না। মূলতঃ তখনই তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় সন্তান কুরবানির মান্নত করেন। পরবর্তীতে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর জন্ম হয় এবং পর্যায়ক্রমে উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর বয়স যখন সাত মতান্তরে ১২ তথা উপযুক্ত হন, তখনই হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম স্বপ্নে নির্দেশপ্রাপ্ত হন। হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার মান্নত পূরণ করো। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সারাদিন চিন্তা করলেন, পরের দিন আবারও স্বপ্ন দেখলেন হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার প্রিয় বস্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানি দাও। সে দিনও সারাদিন চিন্তামগ্ন হয়ে কাটিয়ে দিলেন পরের রাত একেবারে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হল।

অবশেষে জানলেন, বুঝলেন এবং নিশ্চিত হলেন, আর প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে ডেকে বললেন। প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে জবেহ (কুরবানী) করতে। এখন তোমার অভিমত কী? শিশু ইসমাইল আলাইহিস সালাম নির্দ্বিধায় বলে দিলেন বাবা - আপনাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা-ই পালন করুন। নিশ্চয়ই আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মাঝে পাবেন।

আদরের দুলালের মুখে এমন কথা শুনে পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরিয়া আদায় করলেন। যিলহজ্বের দশ তারিখ যথারীতি পিতা-পুত্র উভয়ে মিনার প্রান্তরে গিয়ে কুরবানির প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় শিশুপুত্র বাবার কাছে কিছু আবেদন করলেন, আব্বাজান! আমি আমার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে পারিনি। আমি প্রস্তুত। আমাকে জবেহ করার পূর্বে ভাল করে আমার হাত- পা বেঁধে ফেলবেন। কারণ, জবেহের কষ্টে যদি আমার হাত-পা নড়াচড়া করি আপনার শরীরে লেগে যেতে পারে, যা হবে চরম বেআদবী। জবেহের পর আমার রক্তমাখা কাপড়-চোপড় আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাবেন; যা দেখে অন্তত আমার মা পুত্র হারার বেদনায় কিছুটা শান্তনা খুঁজে পাবেন। আর জবেহের পূর্বে আপনার দু'চোখ বেঁধে

ফেলবেন, যাতে আমার প্রতি কোন মায়া সৃষ্টি হয়ে না যায়, যা আপনার পরীক্ষা ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। ছুরিটা ভাল করে ধারালু করে নিবেন যাতে আপনার কষ্ট না হয়।

শুরু হল কুরবানীর মূল পর্ব। শিশুপুত্রকে মাটিতে শুইয়ে ধারালো ছুরি চালনা শুরু করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এক পর্যায়ে রাগ করে ছুরি নিক্ষেপ করলে গিয়ে পড়ল একটা কঠিন পাথরের উপর। ছুরি এতই ধারালো ছিল যে পাথর টুকরো টুকরো হয়ে গেল। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলে উঠলেন-হে ছুরি তুমি কঠিন পাথর কেটে টুকরো টুকরো করতে পার কিন্তু আমার সন্তানের কোমল চামড়া কাটতে পার না। ঐ ছুরি থেকে আওয়াজ বের হল - ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আমাকে কাটার নির্দেশ দিলেও মহান আল্লাহ আমাকে নিষেধ করে রেখেছেন।

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র দরবারে আবারও কান্নাকাটি করলেন - আল্লাহ আমার পরীক্ষায় কামিয়াব কর। তিনি আবারো চোখ বেঁধে ছুরি চালালেন। এবার অনুভব করলেন জবেহ হয়ে গেল। তখন বলছিলেন বিসমিল্লাহ, পার্শ্ব থেকে আওয়াজ শোনা গেল ওয়ালিল্লাহিল হামদ। তাড়াতাড়ি চোখের বাঁধন খুলে দেখলেন এক পার্শ্বে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আর অন্যপাশে শিশুপুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালাম। আর সামনে একটি দুম্বা জবেহকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম অবস্থা দর্শনে বিব্রত বোধ করলে গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো যা পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾

অর্থাৎ: আমি আহবান করলাম হে ইবরাহীম নিশ্চয় তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছ। এভাবেই আমি পুণ্যবানদের পুরস্কৃত করে থাকি। মূলত একটি দুম্বার মাধ্যমে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর কুরবানি আল্লাহ পাক কবুল করলেন এবং পরবর্তীতে আমাদের শরিয়তে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের উপর কুরবানি আবশ্যক করে দেয়া হলো।

হাদীসে পাকে এসেছে - সাহাবীগণ নবীজির কাছে জানতে চাইলেন। কুরবানি কী? হুযূর বললেন - তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম - এর সুন্নাত। তারা আবার জানতে চাইলেন এতে কী ফজিলত? কুরবানির পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী লেখা হবে।

নারায়ে তাকবির
নারায়ে রিসালাত
নারায়ে গাউছিয়া

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

আল্লাহু আকবার
ইয়া রাসূলাল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]
ইয়া গাউছুল আজম দস্তগীর

গাউসুল আজম জামে মসজিদ

প্রতিষ্ঠাতা খতীব: উস্তাজুল উলামা, শায়খুল ইসলাম- অধ্য আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (র.)

নির্মাণ ও সংস্কার চলছে

আপনিও শরিক হয়ে উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল করুন।

আরজগুজার

মুহাম্মদ শাহ্ আলম, নির্বাহী সভাপতি
০১৬৭০৮২৭৫৬৮

মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, সেক্রেটারী
০১৫৫২৪৬৫৫৯৯

গাউসুল আজম জামে মসজিদ, শাহ্‌জাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

হজ্জ ও উমরার ফজিলত

- সৈয়দ মিনহাজ উদ্দীন

হজ্জ পালন উত্তম ইবাদত ঃ

১عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো সর্বোত্তম আমল কোনটি? জাবাবে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো: তারপর কোন আমল? তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আবার জিজ্ঞাস করা হলো- এরপর কোন আমল? জবাবে তিনি বললেন, "মাবরূর হজ্জ" (কবুল হজ্জ)। (বুখারী শরীফ- ২৬, ১৫১৯ ও মুসলিম শরীফ-৮৩)

হাজীগণ আলাহ্র মেহমান ঃ

২عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر، وفد الله، دعاهم، فأجابوه، وسألوه، فأعطاهم»

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং হজ্জ ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান। আল্লাহ তাদের আহবান করেছেন, তারা সে আহবানে সাড়া দিয়েছে। তারা আল্লাহর কাছে যা চাইছে আল্লাহ তাই তাদের দিয়ে দিচ্ছেন। (ইবনে মাজাহ ২৮৯৩)

৩. عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحجاج والعمار، وفد الله إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم»

(৩) অন্য হাদীসে আছে, আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হজ্জ ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান। তারা দোয়া করলে তা কবুল হয়ে যায় এবং গুনাহ মাফ চাইলে তা মাফ করে দেয়। (ইবনে মাজাহ-২৮৯২)

(৪) তিন ব্যক্তি আল্লাহর মেহমান : ক) হাজী, খ) উমরা পালনকারী, গ) আল্লাহর পথে জিহাদকারী। (নাসাঈ)

হজ্জ জিহাদতুল্য ইবাদাত ঃ

৫. عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني جبان واني ضعيف فقال: هلم الى جهاد شوكة الحج (الطبراني)

(৫) হাসান ইবন আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে আরজ করল আমি একজন ভীতু ও দুর্বল ব্যক্তি। তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এমন একটি জিহাদে চলো যা কন্টকাকীর্ণ নয় (অর্থাৎ হজ্জ পালন করতে চলো।) (তাবারানী)

6. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ، وَالْمَرْأَةِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ"

(৬) আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বয়স্ক, শিশু, দুর্বল ও নারীর জিহাদ হলো হজ্জ এবং উমরা পালন করা।" (নাসাঈ ২৬২৬)

৭. عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور»

(৭) আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করেন। আমরা (নারীরা) কি জিহাদ করতে পারব না? উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, “তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো মাবরূর হজ্জ (কবুল হজ্জ)।” (বুখারী ও মুসলিম)

(৮) অন্য এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة-

হ্যাঁ, নারীদের উপর জিহাদ ফরয। তবে এ জিহাদে কোন মারামারি ও সংঘাত নেই। আর সেটা হলো : হজ্জ ও উমরা পালন করা। (আহমাদ ২৪৭৯৪)

(ঘ) হজ্জ গুনাহ মুক্ত করে দেয় ঃ

৯. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سيار أبو الحكم، قال: سمعت أبا حازم، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج لله فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه»

(৯) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য হজ্জ করল এবং হজ্জকালে যৌন সম্ভোগ ও কোন প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হলো না সে যেন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতই নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরল। (বুখারি:১৫২১)

১০. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟

(১০) আমর ইবনুল আসকে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তুমি কি জান না ইসলাম গ্রহণ করলে পূর্বের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তদ্রূপ হিজরতকারীর আগের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং হজ্জ পালনকারীরা পূর্বের গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। (মুসলিম শরীফ-১২১)

১১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ.

(১১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন, “তোমরা হজ্জ ও উমরা পালন কর। কেননা হজ্জ ও উমরা উভয়টি দরিদ্রতা ও পাপরাশিকে দূরীভূত করে, যেমনিভাবে রেত স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহার মরিচা দূর করে দেয়। আর মাবরূর হজ্জের বদলা হলো জান্নাত। (তিরমিযী: ৮১০)

হজ্জের বিনিময় হবে বেহেশত ঃ

১২. عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»

(১২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন, এক উমরা থেকে অপর উমরা পালন করার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে হয়ে যাওয়া পাপরাশি এমনিতেই মাফ হয়ে যায়। আর মাবরূর হজ্জের বিনিময় নিশ্চিয় জান্নাত। (বুখারী-১৭৭৩)

হজ্জে খরচ করার ফযীলত ঃ

(১৩) বুরাইদা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন, হজ্জে খরচ করা আল্লাহর পথে (জিহাদে) খরচ করার সমতুল্য সাওয়াব। হজ্জে খরচকৃত সম্পদকে সাতশত গুণ বাড়িয়ে এর প্রতিদান দেয়া হবে। (আহমাদ:২২৪৯১)

অন্যান্য প্রতিদান ঃ

(১৪) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন, আরাফাতের দিন এত অধিক সংখ্যক লোককে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য কোন দিন দেন না। এরপর তিনি (হাজীদের) নিকটবর্তী হয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন, এরা কী চায়? (অর্থাৎ হাজীরা যা চাচ্ছে তা তাদেরকে দিয়ে দেয়া হলো)। (মুসলিম)

(১৫) সর্বোত্তম দু'আ হলো আরাফাতের দিনের দু'আ। (তিরমিযী)

হজ্বে বাইতুল্লাহর মুল পাঁচদিনের কার্যক্রম

- হাবিবুল মুস্তফা

মক্কা শরীফ হতে মিনায় যাত্রা ঃ

৮ যিলহজ্জ তারিখে তামাত্তুকারী ও মক্কাবাসীদেরকে অবশ্যই হজ্জের ইহরাম বাঁধতে হবে। এর পূর্বেও জায়েয আছে। এ ইহরাম মসজিদে হারামে বাঁধা মুস্তাহাব। তবে হারামের সীমার মাঝে অপর যে কোন স্থানে বাঁধা জায়েয। কিরানকারীর নতুন ইহরাম প্রয়োজন নেই। কারণ তাঁর পূর্ব ইহরাম বহাল আছে।

৮ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মক্কা শরীফ হতে মিনায় যাত্রা করে রাত্রে মিনায় অবস্থান করতে হবে। কিন্তু ৮ তারিখ সূর্য ঢলার পর মক্কা শরীফ হতে রওয়ানা করে মিনায় যুহরের নামায পড়লেও কোন দোষ নেই।

৮ তারিখ মিনায় গিয়ে সেখানে যুহর, আসর, মাগরির, ইশা ও ফজর - এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায় পড়া মুস্তাহাব। আর মিনাতেই রাত্রি যাপন করা উচিত। মক্কা শরীফে বা অন্য কোথাও থাকা সুন্নতের খেলাফ।

মিনায় যাওয়ার সময় এবং সেখানে অবস্থানকালে তালবিয়া পড়তে হবে।

৮তারিখে মিনায় অবস্থানকালে বিশেষ কোন কাজের নির্দেশ নেই। সেখানে কেবল অবস্থান ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া সুন্নত।

মিনাতে অবস্থানের ব্যবস্থা মু'আল্লিমগণই করে থাকেন। এ ছাড়া অনেক তাঁবু তৈরী থাকে। নিজেরাও ভাড়া করে নেওয়া যায়।

৯ যিলহজ্জ ফজরের নামাযের সালামের পর প্রথমে তকবীরে তাশরীক এবং পরে তালবিয়া পড়বেন। তকবীর তাশরীক:

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد-

আরাফাতের ময়দানে ঃ

আরাফাত একটি নির্দিষ্ট স্থান বা ময়দানের নাম। তা মক্কা শরীফ হতে তায়েফের পথে মুযদালিফার অদূরে অবস্থিত। এর উত্তর প্রান্তে জাবাল-ই-রহমত এবং উত্তর-পূর্ব প্রান্তে জাবাল-ই-আরাফাত নামে দু'টি ছোট্ট পাহাড় আছে। কথিত আছে, বেহেশত হতে বের হওয়ার পর হযরত আদম (আ:) ও হযরত হাওয়া (আ:) প্রথমে এখানেই একে অন্যের পরিচয় লাভ করেন। এ কারণেই এর এই নাম হয়েছে। মা'রিফাত শব্দ হতে এর উৎপত্তি যার অর্থ জানা, চেনা বা পরিচয়। আর কারো কারো মতে বান্দাগণ এখানে বিশেষ রকমের এক ইবাদত ও আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে বলেই এর এই নাম হয়েছে।

ওয়াকূফে আরাফাতের গুরুত্ব ও ফযীলত ঃ

ওয়াকূফে আরাফাত (আরাফাতে অবস্থান) হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন (ফরয)। যিলহজ্জের ৯ তারিখে সূর্য ঢলা হতে পরবর্তী রাত্র ফজর হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এক মুহূর্ত পরিমাণ আরাফাতে অবস্থান করলেও এ-ফরয আদায় হয়ে যাবে এবং হজ্জ নসীব হবে। কিন্তু কোন কারণে কোন হজ্জযাত্রী ৯ যিলহজ্জের দিন ও এর পরবর্তী রাতের কোন অংশেও আরাফাতে উপস্থিত হতে না পারলে তার হজ্জ নষ্ট হয়ে গেল। হজ্জের অন্যান্য রুকন ও কার্য, তাওয়াফ, সাঈ, রমী ইত্যাদি কোন ওযরে ফওত হতে গেলে এদের কোন না কোন কাফ্ফারা ও ক্ষতি পূরণ আছে। কিন্তু ওয়াকূফে আরাফাত ফওত হয়ে গেলে এর কোন ক্ষতি পূরণ নেই।

ওয়াকূফে আরাফাতের আসল দিন হলো ৯ যিলহজ্জ। তা হজ্জের ভিত্তি বলে এতটকু সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে যে, কেউ যদি ৯ যিলহজ্জের দিনে উপস্থিত হতে না পারে তবে পরবর্তী রাতের সুবহি সাদিক পর্যন্ত যে কোন সময় সামান্য কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত হলেও তার ওয়াকূফে আরাফাত আদায় হবে এবং সে হজ্জ হতে বঞ্চিত হবে না।

আরাফাতের আহ্কাম ঃ

আরাফাত মক্কা শরীফ হতে পূর্ব দিকে প্রায় নয় মাইল এবং মিনা হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত একটি পর্বত বেষ্টিত ময়দান। পূর্বেই বলা হয়েছে, ৯ যিলহজ্জ তারিখে বেলা হেলার সময় হতে পরবর্তী রাত্রের সুবহি সাদিক পর্যন্ত যে কোন সময় কিছুক্ষণের জন্য হলেও এখানে অবস্থান করা

হজ্জের সর্বশ্রেষ্ঠ ফরয। ওয়াকূফে আরাফাত না করলে হজ্জ ফওত হয়ে যায়।

আরাফাতের ময়দানে যে কোন স্থানে ইচ্ছা অবস্থান করুন। কিন্তু রাস্তায় ও অন্যান্য হাজী সাহেবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবেন না। তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন স্থানে বা রাস্তায় অবস্থান করা মাকরূহ। জাবাল - ই- রহমতের নিকটে অবস্থান করা উত্তম।

বেলা হেলার আগ পর্যন্ত মসজিদে নমিরার কাছে থাকা এবং যুহর ও আসরের নামাযের পর জাবাল -ই- রহমতের নিকট অবস্থান করা উত্তম।

যুহরের ফরযের পর তক্‌বীরে তাশরীক বলবেন। কিন্তু যুহরের সুন্নতে মুআক্কাদা বা নফল পড়বেন না। আসরের পরও যুহরের সুন্নতে মুআক্কাদা বা নফল পড়বেন না।

কোন মুসাফির হজ্জযাত্রী মক্কা শরীফে যদি এমন সময়ে উপস্থিত হন যে ৮ যিলহজ্জ পর্যন্ত পনের দিন হয় না, অথচ তিনি মক্কা শরীফে পনের দিন বা এর অধিক সময় অবস্থানের নিয়ত করেন তবে তার ইকামতের নিয়ত সহীহ হবে না। তিনি মুসাফিরই থাকবেন। কারণ তাকে ৮ যিলহজ্জ তারিখে মিনায় এবং ৯ তারিখে আরাফাতে অবশ্যই যেতে হবে। এজন্য নামাযে তাকে কসরই করতে হবে।

আরাফাতে ওয়াকুফের সময় দাড়িয়ে থাকা মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। বসে, শুয়ে যে কোন প্রকারে ওয়াকুফ করা জায়েয।

ওয়াকূফে হাত উঠিয়ে হামদ ও সানা, দু'আ- দরূদ, যিক্‌র-আযকার, তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব।

নামাযের পর ওয়াকূফ শুরু করবেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'আ-দরূদ ইত্যাদি পড়তে থাকবেন। কিছুক্ষণ দু'আ দরূদ পড়ার পর-পর মাঝে মাঝে তালবিয়া পড়বেন।

ইমামের সাথে দাঁড়ালে যদি ভিড়ের কারণে মনের একাগ্রতা, বিনয় ও নম্রতা নষ্ট হয় এবং একা দাঁড়ালে এসব লাভ হয় তবে একাকী দাঁড়ানোই উত্তম।

সম্ভব হলে ওয়াকূফের সময় ছায়াতে দাঁড়াবেন না। তকলীফের আশংকা থাকলে ছায়াতে দাঁড়াবেন।

৯ যিলহজ্জ তারিখে বেলা হেলার সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের অবস্থান করা ওয়াজিব। সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের সীমানার বাইরে চলে গেলে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরে আসলে দম দিতে হবে না। তবে সূর্যাস্তের পর ফিরে আসলে দম দিতে হবে।

শুক্রবারে ওয়াকূফে আরাফাত হলে এর ফযীলত অন্যান্য দিনের ওয়াকূফের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি হয়ে থাকে।

আরাফাত হতে মুযদালিফায় ঃ

ওয়াকূফে আরাফাতের সময় যখন সূর্য অস্ত গেল ও হলুদ রংও বিলুপ্ত হলো এবং সূর্যাস্তের ব্যাপারে সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকল না তখন গাম্ভীর্য ও স্থিরতার সাথে মুয্‌দালিফার দিকে রওয়ানা করবেন। না দ্রুত গতিতে পথ চলবেন, না খুব ধীর গতিতে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরূপই করেছিলেন। তিনি যখন প্রশস্ত ময়দান দেখতেন তখন কিছুটা দ্রুত চলতেন এবং যখন কোন টিলার কাছে পৌঁছতেন তখন উটের লাগাম শিথিল করতেন যেন উট সহজে টিলায় চড়তে পারে। সমগ্র পথে তিনি তালবিয়া পড়ছিলেন।

পথে একবার নেমে হাযত সেরে তিনি ওযূ করে নেন। হযরত উসামা (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল, এখন কি নামায? উত্তরে তিনি বললেন নামায সামনে এগিয়ে পড়ব। তারপর তিনি আবার ওযূ করলেন। তারপর তিনি আযানের নির্দেশ দিলেন। অবশেষে ইকামতের সাথে নামায শুরু করলেন। তখনো উটের সামান নামানো হয়নি এবং উটগুলোও যথাস্থানে বসানো হয়নি। সবাই তাড়াতাড়ি সামান নামিয়ে নামাযে শরীফ হলেন। এক নামায পড়ে আযান ছাড়াই কেবল ইকামত দ্বারা দ্বিতীয় নামায পড়লেন। দু'নামাযের মাঝে অন্য কোন নামায তিনি পড়েননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং সুচারুরূপে পথ চল। কোন দুর্বল ব্যক্তিকে পিষ্ট করো না এবং মুসলমানকে কষ্ট দিয়ো না।

মুয্‌দালিফা হারাম শরীফের অন্তর্ভুক্ত। তাই (সম্ভব হলে) গোসল করে এখানে প্রবেশ করবেন (মুস্তাহাব)। পায়ে হেঁটে প্রবেশ করলে আরো উত্তম এবং হারাম শরীফের সম্মানের উপযোগী। পথিমধ্যে সজোরে 'লাব্বায়ক'

বলতে থাকবেন। মুযদালিফায় পৌঁছে এই দু'আ পড়বেন:-

للهم ان هذه مزدلفة جمعت فيها السنن مختلفة نسألك
حوائج مؤتنف فاجعلني ممن دعاك فاستجبت له وتوكل
عليك فكفيته-

হে আল্লাহ, এটা মুয্দালিফা। এতে বিভিন্ন সুন্নতের সমাবেশ হয়েছে। আমরা তোমার কাছে নতুন ভাবে প্রয়োজনাদি প্রার্থনা করছি। অতএব তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো, যাদের দু'আ তুমি কবুল করে থাকো এবং যারা তোমার উপর ভরসা করে তুমি তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও।

(ইয়াহ্ ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, বাংলা সংস্করণ, ৪২৯ পৃ।)

মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায ঃ

আরাফাতের ময়দানে মাগরিবের নামাযের সময় হওয়া সত্ত্বেও সেখানে বা পথে মাগরিবের নামায পড়বেন না। বরং মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত হলে এক আযানে ও এক ইকামতে জামা'আতের সাথে মসজিদ বা অন্য কোন স্থানে প্রথমে মাগরিবের তিন রাক'আত ফরয এবং তারপর ইশার ফরয পড়বেন। মাগরিবের সুন্নত না পড়ে কেবল তক্বীরে তাশরীক ও তালবিয়া বলে বিনা আযানে বিনা ইকামতে ইশার নামায পড়বেন। মুসাফির হলে দু'রাক'আত, আর মুকীম হলে চার রাক'আত পড়বেন। সালামের পর তকবীরে তকবীরে তাশরীক ও তালবিয়া পড়বেন। মাগবির-এর সুন্নত ইশার সুন্নতের পর পড়বেন। বিতর সে সময় পড়লে সুন্নতের পর পড়বেন। অন্যথায়, তাহাজ্জুদের অভ্যাস থাকলে শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের পর বিতর পড়বেন। তাও ইবাদতের একটি রাত এবং মুযদালিফার ইবাদত ও দু'আ কবুলের একটি প্রধান স্থান। সুতরাং যত পারেন নফল নামায পড়বেন, দু'আ করবেন, তওবা ইস্তিগফার করবেন এবং দরূদ শরীফ পড়বেন। বেহুদা সময় নষ্ট করবেন না। তবে নফল ইবাদত বেশি করতে গিয়ে যেন অসুস্থ হয়ে না পড়েন। তা হলে পরে অনেক জরুরি কাজেও ব্যাঘাত ঘটবে। সুতরাং খুব সাবধান থাকবেন।

যানবাহন যোগে মাগরিবের সময় থাকতেই মুযদালিফায় পৌঁছলেও মাগরিবের ওয়াক্তে মাগরিবের নামায পড়বেন না। বরং ইশার সময় হলে উক্ত তারতীব অনুসারে পড়বেন। আরাফাতের দিনে মসজিদে নামিরাতে ইমামের সাথে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়া ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। সুতরাং সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি যুহর ও আসর একত্রে না পড়ে এবং যুহরের ওয়াক্তে যুহর ও আসরের ওয়াক্তে আসর পড়ে তবে তার নামায হয়ে যাবে। কিন্তু মুযদালিফায় ইশার ওয়াক্তে মাগরির ও ইশা একত্রে পড়া বিনা শর্তে ওয়াজিব। সুতরাং যদি কেউ আরাফাতে বা পথে মাগরিবের ওয়াক্তে মাগরির পড়ে নেয় তবে তার নামায হবে না। মুযদালিফায় এসে ইশার সাথে তরতীব অনুসারে এ নামায আবার পড়বে হবে।

মুযদালিফায় পৌঁছামাত্র মাগরিব ও ইশার নামায তাড়াতাড়ি এমনকি কষ্ট না হলে মাল- সামান যানবাহন হতে নামানোর পূর্বে পড়া মুস্তাহাব।

মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে পড়ার জন্য জামা'আত শর্ত নয়। একাকী বা জামা'আতে উভয় অবস্থায়ই একত্রে পড়তে হবে। তবে জামা'আতে পড়াই উত্তম।

মাগরিব ও ইশা আরাফাত বা পথে পড়ে থাকলে মুযদালিফায় এসে আবার পড়বে হবে। কিন্তু পড়বার পূর্বে ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেলে সে নামাযই হয়ে যাবে। কাযা ওয়াজিব হবে না।

আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তনের পথে যদি আশংকা হয় যে, মুযদালিফায় পৌঁছতে পৌঁছতে ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাবে তবে রাস্তায় মাগরিব ও ইশার নামায পড়া জায়েয আছে। তবে উভয় নামায এদের নিজ নিজ ওয়াক্তে পড়তে হবে।

আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তনের সময় পথ ভুলে মুযদালিফায় পৌঁছতে পারেননি, এমতাবস্থায় নামায পড়তে দেরি করে সুবহি সাদিক ঘনিয়ে আসলে নামায পড়বেন।

মুযদালিফা হতে মিনার দিকে ঃ

মুযদালিফা হতে মিনার দিকে রওয়ানার মুস্তাহাব সময় সূর্যোদয়ের একটু পূর্বে অর্থাৎ দু'রাক'আত নামায পড়া যায় একটুকু পূর্বে। তকবীর, তালবিয়া, ইস্তিগফার এবং দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে রওয়ানা হবেন। অনেক ব্যস্তভাবে পথ চলবেন না। বরং শান্তভাবে চলবেন। **কঙ্কর সংগ্রহ ঃ**

মুযদালিফার ময়দান বা সড়ক হতে সত্তরটি কঙ্কর তুলে নিবেন। সাতটি কঙ্কর প্রথম দিনে অথার্ৎ ১০ যিলহজ্জ তারিখে জামরায়ে আকাবাকে সাতটি কংকর মারতে হবে (বড় শয়তান)। এ কঙ্করগুলো মুযদালিফা হতে নেয়া মুস্তাহাব। বাকী দুই দিন অর্থাৎ ১১, ১২ যিলহজ্জ তারিখে তিনটি জামরাতের প্রতিটিকে প্রত্যেকবার সাতটি করে কংকর মারতে হবে। এগুলো মুযদালিফা হতে নেয়া ভাল। মিনা হতে নিলেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যেখানে কংকর মারা হয় সে স্থান হতে কংকর নিলে মাক্রূহ, কারণ হাদীস শরীফে আছে, যাদের হজ্জ কবুল হয় তাদের কঙ্কর উঠিয়ে নেয়া হয় এবং যাদের হজ্জ কবুল হয় না তাদের গুলো সেখানে পড়ে থাকে। সুতরাং যে সব কঙ্কর সেখানে পড়ে থাকে সেগুলো প্রত্যাখ্যাত। তাই সেগুলো উঠিয়ে নেয়া সঙ্গত নয়।

বড় কঙ্কর ভেঙ্গে টুকরা না করে বরং যেসব ছোট ছোট কঙ্কর পাওয়া যায় তা-ই-কুড়িয়ে নিবেন। খুব ছোট বা খুব বড় কঙ্কর নিবেন না। ছোলা বা মটর দানা হতে একটু বড় হলেই চলবে যাতে আঙ্গুলের ডগায় আসে। বড় কঙ্কর ভেঙ্গে ছোট করা, নাপাক স্থান হতে কঙ্কর সংগ্রহ করা এবং মসজিদে রাখা বা অন্য কোন মসজিদ হতে কঙ্কর কুড়িয়ে নেয়া মাকরূহ। পাক জায়গা হতে সংগ্রহ করে থাকলেও কঙ্কর ধুয়ে নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব এবং নাপাক কঙ্কর নিক্ষেপ করা মাকরূহ। বড় বড় পাথর বা কঙ্কর মারা জায়েয আছে বটে, কিন্তু মাকরূহ।

জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ ঃ

মিনাতে তিন স্থানে বেশ দূরে দূরে তিনটি স্তম্ভ আছে। এগুলোকে জামরাত বলে। এগুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপ করাও হজ্জের জরুরি কাজের অন্তর্ভুক্ত। ১০ যিলহজ্জ শুধু জামরায়ে আকাবা বা বড় জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয় এবং ১১, ১২ যিলহজ্জ তারিখে তিনটি জামরাতের প্রত্যেকটিকে প্রত্যেকবার সাতটি করে কঙ্কর মারতে হয়। এটা সুস্পষ্ট যে, কঙ্কর নিক্ষেপ করা সাধারণত কোন নেক আমল নয়। বরং প্রতিটি আমলই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। আর বিনা বিবাদ ও বিনা দ্বিধায় আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করাকেই তো বন্দেগী বলে। এ ছাড়া আল্লাহর বান্দা যখন তাঁর নির্দেশে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের ধ্যান রেখে এবং তার বড়ত্বের শ্লোগান দিয়ে শয়তানি ধ্যান- ধারণা, আদত অভ্যাস, প্রবৃত্তির তাড়না ও পাপাচারকে লক্ষ্য করে এসব জামরাতকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে এবং এরূপে গোমরাহি ও পাপকে প্রস্তরাঘাতে নিপাত করে দেয় তখন তার অন্তরে যে কি অনির্বচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তার ঈমানে ভরা হৃদয়ে যে কি প্রশস্ততা ও আনন্দের উদ্রেক হয়ে থাকে তা কেবল তিনিই জানেন। বস্তুত আল্লাহর নির্দেশে ও তার নাম নিয়ে জামরাতকে কঙ্কর নিক্ষেপ করার অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের নযরে ঈমানের নূর বৃদ্ধিকারক আমলরূপেই উদ্ভাসিত হয়ে থাকে।

তালবিয়ার শেষ সময় ঃ

১০ তারিখে জামরাতুল উকবাকে কঙ্কর মারার সময় হতেই তালবিয়া পড়া বন্ধ করবেন। এর পর আর পড়বেন না। ইফরাদ, কিরান বা তামাত্তুকারী কেউই পড়বেন না। বেলা হেলা পর্যন্ত কঙ্কর নিক্ষেপ না করে থাকলে নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত তালবিয়া বন্ধ করবেন না। কিন্তু কঙ্কর নিক্ষেপ না করা অবস্থায়ই সূর্যাস্ত হয়ে গেলে তালবিয়া বন্ধ করে দিবেন।

বড় জামরাতে কঙ্কর নিক্ষপ করে এর কাছে থাকবেন না। বরং নিজ স্থানে চলে আসবেন।

ওমরা করার নিয়ম ও প্রাসঙ্গিক মাসায়েল

- শফিউল আযম

উমরা শব্দের আভিধানিক অর্থ যিয়ারত। ইসলামের পরিভাষায় মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করাকে বুঝায়। উমরাকে ছোট হজ্জও বলা হয়ে থাকে। সামর্থবান লোকের জন্য সারাজীবনে একবার উমরা করা সুন্নাতে মুআক্কাদা।

উমরা কাকে বলে ঃ

উমরা হলো কয়েকটি কাজের সমষ্টি : (১) ইমরাম (২) তাওয়াফ (৩) সাঈ এবং (৪) মাথা মুন্ডানো।

৯ যিলহজ্জ হতে ১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত পাঁচদিন উমরা করা জায়েয নয়। এ পাঁচ দিন ছাড়া সারা বছর, দিন রাত্রে যে কোন দিন, যে কোন সময় যত ইচ্ছা উমরা করা যায়। বিশেষত রমযান মাসে উমরার ফযীলত খুব বেশি। হাদীস শরীফে আছে, রমযান মাসের একটি উমরা একটি হজ্জের সমান। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে, তিনটি উমরা একটি হজ্জের সমান এবং সাতটি তাওয়াফ একটি উমরার সমান।

ওমরা করার নিয়ম ঃ

উমরার জন্য হজ্জের ইহরামের ন্যায় মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে বাবুস সালাম বা বাবুল উমরা দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন। মক্কা শরীফে প্রবেশের সব আদব রক্ষা করবেন এবং ইহরাম অবস্থায় সব হারাম ও মাকরূহ বিষয় হতে বেঁচে থাকবেন। তার পর রমল ও ইযতিবার সাথে তাওয়াফ করবেন। তাওয়াফ শুরুর সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ করবেন। সাত চক্কর তাওয়াফ পূর্ণ করে দু'রাক'আত তাওয়াফের নামায পড়বেন। তারপর যমযমের পানি পান করে মুলতাযামে গিয়ে মুনাজাত করবেন। হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করে অথবা দূর থেকে ইশারায় চুম্বন করে বাবুস সাফা দিয়ে বের হবেন এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করবেন। সাঈ শেষ করে মাথা মুন্ডাবেন বা চুল ছেঁটে ফেলবেন - এ পর্যন্ত করলেই উমরা হয়ে গেল। প্রকাশ থাকে যে, প্রথম তিন চক্করে রমল করবেন। রমল মানে ছোট ছোট কদমে দ্রুত হাঁটা।

মসজিদে হারাম শরীফের আদব ও তাযীম ঃ

মসজিদে হারাম : বায়তুল্লাহ শরীফের মসজিদের নাম মসজিদে হারাম। বায়তুল্লাহ শরীফ মসজিদে হারামের একেবারে মধ্যস্থলে অবস্থিত।

মক্কা শরীফে প্রবেশ করামাত্রই মসজিদে হারামে হাযির হওয়া মুস্তাহাব। তৎক্ষণাৎ সম্ভব না হলে আসবাব পত্র তাড়াতাড়ি গুছিয়ে রেখে সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে হাজির হওয়া উচিত।

বাবুস সালাম দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করা মুস্তাহাব।

তালবিয়া পড়তে পড়তে নিতান্ত নম্রতা ও বিনয়ের সাথে দরবারে ইলাহীর আয্মত ও জালালের দিকে লক্ষ্য রেখে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন এবং প্রথমে ডান পা ভিতরে রেখে এই দু'আ পড়বেন:

بسم الله وا م على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك-

(বসমিল্লাহি ওয়াস সালামু আালা রসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা)।

মসজিদে হারামে প্রবেশের পর বায়তুল্লাহ শরীফ দৃষ্টি গোচর হওয়ামাত্র তিনবার বলবেন "আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর" ।

বায়তুল্লাহ শরীফ দেখার সময় হাত উঠিয়ে দু'য়া করবেন। ঐ সময় যে দোয়াই করা হয় তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়।

বায়তুল্লাহ শরীফ দেখার সময় দাঁড়িয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব।

যে দু'আতে অধিক বিনয় ও নম্রতা হাসিল হয় এবং মন বেশি নিবিষ্ট হয়ে থাকে সে দু'আ পড়াই উচিত। তবে রাসূলুল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে দু'আ করতেন তা স্মরণ থাকলে তা পড়াই উত্তম।

মসজিদে হারামে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়বেন না। এ মসজিদের তাহিয়্যাহ (অভিবাদন) হলো তাওয়াফ। তাই দু'আর পরই তাওয়াফ করবেন। কিন্তু তাওয়াফ করতে গেলে যদি ফরয নামায কাযা হওয়া, মুস্তাহাব ওয়াক্ত চলে যাওয়া অথবা জামাআত ফওত হওয়ার আশংকা থাকে তবে মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বেন।

মসজিদে হারামে প্রবেশ করে যদি দেখেন জানাযা হাযির আছে এবং সুন্নাতে মুআক্কাদা ও বিতর আপনি পড়ে না থাকেন তবে এগুলো তাওয়াফের পূর্বে আদায় করবেন। কিন্তু তাহাজ্জুদ, চাশত ইত্যাদি নামায তাওয়াফের পূর্বে পড়বেন না।

মসজিদে হারামে বরং প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশের সময় নফল ইতিকাফের নিয়ত করা মুস্তাহাব। নফল ইতিকাফ অল্প সময়ের জন্যও জায়েয।

নামাযের সামনে দিয়ে তাওয়াফকারীদের যাওয়া মসজিদে হারামে জায়েয।

কোন অমুসলমানকে হারাম শরীফের ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া জায়েয নয়।

হারাম শরীফের মধ্যে কোন অমুসলমানকে কবর দেয়া হারাম।

হারাম শরীফের সীমার ভিতরের মাটি ও পাথর এর বাইরে নিয়ে যাওয়া নিষেধ।

যদি কেউ মক্কা মুকাররামা বা বায়তুল্লাহ শরীফ কেবল দেখার ইচ্ছা করে তবে তারও হজ্জ অথবা উমরার নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে যেতে হবে।

গোটা মুসলিম জগতের উপর মক্কায়ে মুকাররমা ও বায়তুল্লাহ শরীফের তাযীম, খিদমত এবং হজ্জ করা ফরয। আল্লাহ না করুন, যদি কোন বছর এমন হয় যে, কেউ হজ্জ করতে না যায় তবে সমগ্র মুসলিম জগৎ গুনাহগার হবে।

সুমাইয়া সার্জিক্যাল

এখানে সকল প্রকার হাসপাতালের মালামাল পাওয়া যায়। ডায়বেটিক, প্রেসার ও ওজন মাপার মেশিন, নেবুলাইজার ডিজিটাল বিপি ও থেরাপি মেশিন, বডি ম্যাসেঞ্জার, জ্বর মাপার থারমোমিটার এবং যাবতীয় সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ইকুইপমেন্ট সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

**ঢাকায় মালামাল হোম ডেলিভারি দেয়া হয়।*

১৫/২ তোফখানা রোড, বি.এম.এ ভবন, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৯৫৫৫২০৪, মোবাইলঃ ০১৭১১৫৯২৬৫৮, ০১৭১২২৩৫৫১৩

যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারা সফর নাজাতের উসিলা

- মুফতি মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে যিয়ারতে মদীনার রয়েছে অশেষ ফযীলত। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, ঈমানদার মুসলমানের প্রাণপ্রিয় সেই মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারতকে কতিপয় জ্ঞানপাপী নাজায়েয, শিরক ইত্যাদি ফতোয়াবাজি করে সরলমনা মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এরা সহীহ বুখারী শরীফের একটি হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বঞ্চিত করতে চায়। তারা যে হাদীস দ্বারা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে যেতে নিষেধ করে সেই হাদীসেই মূলত মদীনা শরীফ যাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। আমরা প্রথমে যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারার ফযীলতের বর্ণনা শুরু করব।

عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءنى زاءر لاتحمله حاجة الازيارتى كان حقا على ان اكون له شفيعا يوم القيامة-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার যিয়ারতের উদ্দেশে আসে এবং তার সফরে আমার যিয়ারত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকেনা, ক্বিয়ামত দিবসে তার জন্য শাফা'আতকারী হওয়া আমার হক্ব (দায়িত্ব) হয়ে যায়। (দারে কুতনী, মাজমা'উয যাওয়াইদ, মীযানুল ই'তিদাল)

এ হাদীস শরীফে বিশেষত দু'টি বিষয় পরিলক্ষিত। প্রথমত যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা, আর দ্বিতীয়ত শাফা'য়াতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা আশিক্বে রসূলের জন্য অতৃপ্ত বাসনা, একজন ঈমানদারের জন্য বিশাল নি'মাত, প্রাণাধিক প্রিয় রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে সরাসরি হাযির হয়ে নিজের মনের গভীরে লালিত দীর্ঘদিনের কথাবার্তা - আলাপ - আকুতি পেশ করার সুবর্ণ সুযোগ তো এটাই। উম্মতের কান্ডারী উভয়জগতের মুক্তির দিশারীও অপেক্ষায় থাকেন দুঃখী উম্মতের আকুতি- মিনতি শুনে তাদেরকে মুক্তির ঠিকানায় পৌঁছাতে। জীবদ্দশায় সাহাবা - ই কেরাম বিপদ - মুসিবতে নবী করীমের দরবারে গিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান নিয়ে যেতেন। তদ্রূপ ইহজগত থেকে আড়াল হওয়ার পরও সমানভাবে বিপদগ্রস্ত উম্মতের সাহায্যে নবী করীমের রয়েছে সক্রিয় ক্ষমতা ও ভূমিকা। এ নিয়ে হাজারো দৃষ্টান্ত রয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে পাক সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন –

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى-

অনুবাদঃ তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের দিকে (অধিক সাওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না; মসজিদে হারাম (কা'বা শরীফ), মসজিদে রসূল (মদীনা শরীফের মসজিদে নবভী শরীফ) ও মসজিদে আক্বসা (বায়তুল মুক্বাদ্দাস)। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল জুমু'আহ, মুসলিম শরীফ: কিতাবুল হজ্জ, নাসাঈ শরীফ : কিতাবুল মাসাজিদ)

আমরা জানি, মসজিদে হারাম তথা কা'বা ঘরের মর্যাদা বেশি হওয়ার কারণ হলো, সেটি মহান আল্লাহর ঘর এবং মুসলিম মিল্লাতের ক্বেবলা আর মসজিদে আক্বসার ফযীলত এই কারণে যে, ওটা এক সময় মুসলমানদের ক্বিবলা ছিলো। কিন্তু মসজিদে নবভীর এত ফযীলত কেন? সেটাতো কোন কালে কোন মুসলমানের ক্বেবলা ছিলনা। এর উত্তর একটাই - এই মসজিদের সাথে সম্পর্ক রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর। নবীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে যদি মসজিদে নবভীর মূল্য এত বেড়ে যায়, যেখানে অধিক সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করার কথা হাদীস শরীফে এসেছে, সেই নূর নবীর পবিত্র নূরানী দেহ মুবারক যে রওযা পাকের সাথে লেগে আছে, সেই রওযা মুবারকের মূল্য কত বেশি, তা বিবেক থাকলে বুঝাতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। অধিকন্তু রওজা পাকের ফযীলতের পক্ষে অনেক দলীলতো রয়েছেই।

দ্বিতীয়ত উল্লিখিত হাদীস শরীফ দ্বারা যিয়ারতের উদ্দেশে মদীনা শরীফ যাওয়া নিষিদ্ধ ফতোয়া দেয়া মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ হাদীসের বিষয়বস্তুই হলো নামায; যিয়ারতের প্রসঙ্গ সেখানে নেই। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে ওই হাদীসের শিরোনামই হল, 'বাবু ফাদ্বলিস সালাতি ফী মাসজিদি মাক্কা ওয়াল মাদীনা? (মক্কা ও মদীনা শরীফের মসজিদে নামাযের ফযীলত)। সুতরাং নামায আর যিয়ারত

এক বিষয় নয়। তাই নামাযের ফযীলতের হাদীস দ্বারা যিযারতকে নিষিদ্ধ করার কী যুক্তি থাকতে পারে? আর শুধু নামাযের ফযীলতের উদ্দেশ্যে হাজ্বী সাহেবরা যদি মক্কা শরীফ হতে মদীনা শরীফ যায়, তাহলে নিশ্চয় তাদেরকে বোকা বলতে হবে। কারণ মসজিদে নবভীর চাইতে অনেক বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় মসজিদে হারাম শরীফে। অতএব অধিক সাওয়াবের স্থান রেখে অন্য স্থানে তারা যাবে কোন দুঃখে। তাই নিঃসন্দেহে বলতে হবে বেশি সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকার্‌রামা হতে কেউ মদীনা মুনাওয়ারা সফর করেনা, বরং হাবীবে কিবরিয়া মাহবূবে খোদার সান্নিধ্যে তার খাস দয়া- করুণা ও মেহেরবাণী লাভের উদ্দেশ্যেই সকলে মদীনা শরীফ সফর করে থাকে। পাশাপাশি মসজিদে নবভীতে নামাজের সওয়াব ও লাভ করে ।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাফসীরে ইবনে কাসীরে উদ্ধৃত করেন- উতবা নামক জনৈক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন, আমি একদা নবী-ই আকরামের রওয়া পাকের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় একজন লোক এসে বললেন- আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি শুনেছি আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন-

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا-

অর্থাৎ: আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে (অপরাধ বা গুনাহ দ্বারা আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে) তখন (হে মাহবুব! তারা) আপনার দরবারে হাযির হয়, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই (তারা) আল্লাহকে অত্যন্ত তাওবা কবূল কারী, দয়ালু হিসেবে পাবে। (সূরা নিসা : আয়াত -৬৪)

এই আয়াত তিলাওয়াত করে ওই আগন্তুক নবী-ই আকরামকে সম্মোধন করে বললেন, ইয়া রসূলল্লাহ! আমি আপনাকে শাফা'আতকারী মেনে আমার গুনাহ প্রার্থনাকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাযির হয়েছি। অতঃপর আরবি ভাষায় একটি কবিতা আবৃত্তি করে চলে গেলেন।

হাদিসের বর্ণনাকারী বলেন- এক পর্যায়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম আর স্বপ্নে দেখলাম নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন, হে উতবা! তুমি ওই লোকটাকে ডেকে নিয়ে সুসংবাদ দিয়ে দাও, মহান আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

(সূত্র : বায়হাক্বী : শু'আবুল ঈমান : ৩য় খন্ড ৪৯৫ পৃষ্ঠা, ইবনে কুদামা : আল মুগনী : ৩য় খন্ড ২৯৮ পৃষ্ঠা)

হযরত কা'বুল আহবার রদ্বিয়াল্লাহু ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে সম্বোধন করে বললেন,

هل لك ان تسير معى الى المدينة فنزور قبر النبى صلى الله عليه وسلم فتتمتع بزيارته فقلت نعم يا امير المؤمنين-

অর্থাৎ: আপনি কি আমার সাথে নবী-ই আকরামের রওযা মুবারক যিয়ারতের জন্য যাবেন? এবং যিয়ারতের মাধ্যমে ফয়েয-বরকত হাসিল করবেন? তিনি জবাব দিলেন, জ্বী হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন!

অতঃপর তারা উভয়েই মদীনা মুনায়রায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং প্রথমে হুযূর আকরাম-ই সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে সালাম পেশ করলেন, অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কবর শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সালাম পেশ করলেন। পরিশেষে দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন। (সূত্র : ফাতহুশ শাম : ১ম খন্ড ২৪৪ পৃষ্ঠা কৃত ইমাম ওয়াক্বেদী।)

মদীনায়ে তৈয়্যবা কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে, এমনটি নয়; বরং নবীজি মদীনা শরীফকে অধিক পরিমাণে ভালবাসতেন, আর মহান আল্লাহর দরবারে দো'য়া করতেন-.

اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد-

(হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে মদীনা শরীফের ভালবাসা দান করুন যেমন আমরা ভালবাসি মক্কা শরীফকে অথবা এর চাইতেও বেশি) নবী করীম আরো এরশাদ করেন-

من مات بالمدينة كنت له شفيعا يوم القيامة-

(যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে মৃত্যু বরণ করে, আমি ক্বিয়ামতের দিন তার সুপারিশকারী হব)। ওলামা-ই কেরামের অভিমত হচ্ছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমে মদীনাবাসীদের জন্য এর পরে মক্কাবাসীদের জন্য এরপর তায়েফবাসীদের জন্য সুপারিশ করবেন। (জাযবুল কুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবুব)

অপর বর্ণনায় রয়েছে-

من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا وشهيدا-

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করতে পারে সে যেন মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করে। কারণ যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেব এবং সুপারিশকারী হব।

ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'মুআত্তা-ই মালিক' - এ একটি বর্ণনা এনেছেন- হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি মক্কাকে মদীনা হতে উত্তম মনে কর? তিনি উত্তরে বললেন- 'মক্কা শরীফ আল্লাহর হেরম এবং নিরাপত্তার স্থান এবং সেখানে আল্লাহর ঘর অবস্থিত। হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন- আমি আল্লাহর হেরেম এবং আল্লাহর ঘর সম্পর্কে কিছু বলতে চাইনা। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন-তুমি কি মক্কাকে মদীনার চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে কর? তিনি পুনর্বার জবাবে বললেন, 'মক্কা শরীফ আল্লাহর হেরেম এবং আল্লাহর ঘর বিদ্যমান। হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমি মহান আল্লাহর হেরেম এবং তার ঘর সম্পর্কে কিছু বলছিনা। এভাবে কয়েকবার বলে তিনি চলে গেলেন। হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই কথোপকথন থেকে বুঝা গেল- পবিত্র কা'বাঘর ও হেরেম শরীফ বাদ দিলে সমগ্র মক্কা থেকে মদীনা শরীফই শ্রেষ্ঠ।

মদীনা মুনাওয়ারার এই ব্যাপক মর্যাদার মূল কারণ হল, সেখানে দু'জাহানের সরদর কামলীওয়ালা নবীপাকের পবিত্র রওযা শরীফ। যিয়ারতের ফজীলত বিষয়ক কতিপয় হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করা হল :

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

من زار قبرى وجبت لهٗ شفاعتى-

অর্থ "যে আমার রওযা মুবারক যিয়ারত করে, তার জন্য সুপারিশ করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়" । (দারে কুতনী, নাওয়াদেরুল উসূল, বায়হাক্বী, মীযানুল ই'তিদাল)

হযরত আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত - নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

من زار بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة -

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় হাজির হয়ে আমার যিয়ারত করবে, আমি ক্বিয়ামত দিবসে তার সাক্ষী হব এবং তার জন্য সুপারিশকারী হব।

(সূত্র : বায়হাক্বী, শিফাউস্ সিক্বাম, তালখীসুল হাবীব)

হযরত উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াাসাল্লামকে বলতে শুনেছেন -

من زار قبرى اوقال من زارنى كنت له شفيعا او شهيدا ومن مات فى احد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة-

অর্থাৎ: যে আমার রওযা পাক যিয়ারত করে অথবা বললেন আমার যিয়ারত করে, আমি তার জন্য সাক্ষী ও সুপারিশকারী হব এবং যে হারামাঈনে শরীফাঈনের যে কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামত দিবসে নিরাপদে উঠাবেন। (সূত্র : মুসনাদে ফেরদাউস, দারে কুতনী, বায়হাক্বী।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রদ্বিয়াল্লহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

من حج فزار قبرى بعد وفاتى فكانما زارنى فى حياتى-

অর্থাৎ: যে হজ্ব করল আর আমার ওফাতের পর আমার রওযা পাক যিয়ারত করল, সে যেন জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল। (দারে কুতনী, তাবরানী, মিশকাতুল মাসাবীহ)

নবীজী এরশাদ করেন-

من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى-

অর্থাৎ: যে বায়তুল্লাহ'র হজ্ব করল কিন্তু আমার যিয়ারত করলনা, সে আমাকে কষ্ট দিল' ।

মদীনা শরীফ এবং রওযা পাক যিয়ারতের অশেষ ফযীলতের কতিপয় হাদিসে যিয়ারত না করার কঠিন পরিণতির বর্ণনাও হাদিস শরীফে দেখলাম। সুতরাং এখানেই প্রমাণিত হয়ে যায়, কে নবীজীর আশিক্ব-প্রেমিক, আর কার অন্তরে নবীবিদ্বেষ।

যুগে যুগে হক্ব-বাতিলের সংঘাত ছিল, এখনও রয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, বিবেককে কাজে লাগিয়ে নিজের জীবন পরিচালনা করা। ইবলিস শয়তান এবং তার প্রেতাত্মারা যতই বিভ্রান্ত করতে চাইবে সত্যিকার ঈমানদার ততবেশি সতর্ক হবে। তেমনি বর্তমান বিশ্বের বাতিলপন্থীরা মদীনা শরীফ যিয়ারত তাতবেশি উদ্দেশ্যে যাওয়াকে যতই বিদ'আত, শিরক বলুকনা কেন, প্রেমিকদের জোয়ার ঠেকানো কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। আ'লা হযরতের ভাষায় শুনুন প্রেমিকমনের অভিব্যক্তি -

জা-ন ও দিল হো-শ ও খিরদ সব তো-মাদী-নে পৌঁহছে-
তোম নেহী- চলতে-রেযা-সা-রা-তো সা-মা-নে গেয়া।

রাসূল (দঃ)-এর রওজা যিয়ারতের হাদিস নিয়ে

আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তি নিরসন

- শহিদুল্লাহ বাহাদুর

হাদিস নং –১

যে আমার রওযা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার “হাদীসের নামে জালিয়াতি” বইয়ের ৪৬৩ পৃষ্ঠা হতে ৪৬৫ পৃষ্ঠা (যা আস্-সুন্নাহ পাবলিকেন্স, ঝিনাইদহ হতে সেপ্টম্বর ২০০৮ইং সালে প্রকাশিত) পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনা করে নিম্নের এই সহীহ হাদিসকে দ্বঈফ ও মওদ্বু প্রমাণ করার অনেক চেষ্টা করেছেন। বর্তমানের আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী (মৃত্যু. ১৯৯৯খৃ.) এই হাদিসটিকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আজ পর্যন্ত কোন হক্কানী মুহাদ্দিস উক্ত হাদিসটিকে জাল বা বানোয়াট বলে তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেননি; এই পথভ্রষ্ট আহলে হাদিসরা ছাড়া। এই আলোচনাটি মূলত আমার লিখিত গ্রন্থ ‘প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন’ ১ম খণ্ডের ৪২৩-৪৪১ পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপ।

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي-

“তাবেয়ী না‘ফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আমার রওযা মোবারক যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত অনিবার্য।”[২]

সনদ পর্যালোচনাঃ ইবনে হাযার হাইসামী উক্ত হাদিসটির ইমাম বায্যারের সনদটি প্রসঙ্গে বলেন-

الْبَزَّارُ وَفِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِي، وَهُوَ ضَعِيفٌ

“উক্ত হাদিসটি ইমাম বায্যার বর্ণনা করেছেন আর সনদে “আবদুল্লাহ বিন ইবরাহিম আল-গিফারী” নামক দুর্বল রাবী রয়েছেন।”[৩] মূলত উক্ত হাদিসটির চারটিরও বেশি সনদ রয়েছে, আর প্রত্যেকটি সনদের অবস্থা ভিন্ন, তাই হুকুমও ভিন্ন। এ সনদের উক্ত রাবি দুর্বল তাতে কোন সন্দেহ নেই, কেননা হাইসামী তাঁর উক্ত গ্রন্থের আরও একাধিক স্থানে তাকে দুর্বল বলেছেন।[৪] ইমাম যাহাবী বলেন ‘তাঁর থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী তাঁর শামায়েলে তিরমিযীতে হাদিস এনেছেন।[৫]

হাদিসটির দ্বিতীয় সনদ ঃ সুনানে দারেকুতনীর সনদে ‘মূসা বিন হেলাল’ রাবি রয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে ইমাম দারেকুতনী বলেন وأرجو أَنَّهُ بأس به. -“নিশ্চয় আমি আশা রাখি তাঁর হাদিস গ্রহন করতে অসুবিধা নেই।[৬] ইমাম যাহাবী বলেন– صالح الحديث “তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ ছিলেন।[৭] দু’একজন মুহাদ্দিস উক্ত রাবিকে মজহুল (অপরিচিত) বলেছেন, তার মধ্যে ইমাম দারেকুতনী, আবু হাতেমের পিতাও রয়েছেন।[৮] আমি

---

[১].আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, হা/১১১৩ ও সিলসিলাতুল আহাসিদ্-দ্বঈফাহ, ১২/৫২১পৃ.হা/৫৭৩২, এবং যঈফুল জামেউস সগীর, হা/৫৬০৭

[২].ক. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৬/৫১.পৃষ্ঠা, হাদিস, ৩৮৬২, কাজী আয়াজ আল-মালেকী, আশ্-শিফা শরীফ : ২/৮৩ পৃষ্ঠা, দারেকুতনী, আস-সুনান, ৩/৩৩৪পৃ., হাদিস/২৬৬৫, মুয়াস্সাতুল রিসালা, বয়রুত, লেবানন, বায্যার, আল মুসনাদ, ২/২৪৮পৃষ্ঠা, হাকিম তিরমিযী, নাওয়ারিদুল উসূল ফি আহাদিসুর রুসুল, ২/৬৭পৃষ্ঠা, ইস্পাহানী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/২৭পৃ. হাদিস, ১০৮১, আদি, আল-কামিল, ৮/২৬৯পৃষ্ঠা, ক্রমিক নং.১৮৩৪, ও ৪/১৯০-১৯১পৃষ্ঠা, সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ২০/৩৪৮পৃষ্ঠা, হাদিস, ২২৩০৪, সুয়ূতি, জামিউস-সগীর : ২/৬০৫ পৃষ্ঠা, হাদিস : ৮৭১৫, ইমাম হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৪/২ পৃষ্ঠা, হাদিস, ৫৮৪১, ইমাম তকি উদ্দিন সুবকী : শিফাউস সিকাম ফি যিয়ারাতিল খায়রি আনাম : ১৫ পৃষ্ঠা, মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১৫/৬৫১ পৃ. হাদিস/৪২৫৮৩, শাওকানী, নায়লুল আউতার, ৫/১১৩পৃ.

[৩].ক. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয-যাওয়ায়েদ : ৪/২পৃ. হাদিস-৫৮৪১

[৪].ক. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ১/৬০পৃ. হাদিস/২০৫, ৩/৬৪পৃ. হাদিস/৪৩৪২, ৯/৪১পৃ. হাদিস/১৪২৯৭, মাকতুবাতুল কুদসী, কাহেরা, মিশর।

[৫].ইমাম যাহাবী : তাহযীবুত-তাহযীব, ১/২৪৯পৃ.ক্রমিক নং.৪৬৮

[৬]. আদি, আল-কামিল, ৮/২৬৯পৃষ্ঠা, ক্রমিক নং.১৮৩৪

[৭]. আল-ওয়াদী, রিজালুল দারেকুতনী ফি সুনান, ১/৪৫৭পৃষ্ঠা, ক্রমিক নং.১১৮৫

[৮].যাহাবী, মিযানুল ই‘তিদাল, ৩/১৭২পৃ. ক্রমিক নং. ৬০১১, আবু হাতেম, জররাহ ওয়া তা’দীল, ৮/১৬৬পৃ, ক্রমিক, ৭৩৪, ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৪/২৭৬পৃ. ইবনে জওজী, দ্বঈফাহ ওয়াল মাতরুকুন, ৩/১৫১পৃ. ক্রমিক, ৩৪৭৮

বলবো ইমাম আদি ও ইমাম যাহাবী সহ অনেকে তাঁর পরিচয়ের কথা বলেছেন। এমনকি যাহাবী বলেছেন "আমি তাকে কোন কোন মুহাদ্দিস দ্বঈফ বলতে দেখিনি।[১] ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর উক্ত হাদিসটির শুধু ২টি সনদ বর্ণনার পর পর্যালোচনা করেছেন। মূলত উক্ত হাদিসটির চারটিরও অধিক সনদ রয়েছে। কিন্তু তিনি দুটি সনদ বর্ণনার পর হাদীসের দুটি সনদ হতে কোন একজন রাবী মিথ্যাবাদী আছে বলে প্রমাণ দিতে পারেন নি বরং বলেছেন" সর্বাবস্থায় এই সনদটি দুর্বল হলেও এতে কোনো মিথ্যাবাদী বা মিথ্যা বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত বা পরিত্যক্ত রাবী নেই। (হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৪৬৫)

হাদিসটির অন্যান্য সনদ ঃ তাই প্রমাণ পাওয়া গেল উক্ত হাদীসে কোন মিথ্যাবাদী রাবী নেই। আমি আমার লিখিত গ্রন্থ 'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'১ম খণ্ডের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে হাদিসে দ্বঈফ যখন একাধিক সনদে বর্ণিত হয় তা 'হাসান' পর্যায়ে উন্নিত হয়ে যায়।

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এ হাদিসটির অবস্থান ঃ

১. মুফতি আমিমুল ইহসান (রাহ.) স্বীয় ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার গ্রন্থে উক্ত হাদিসটি সংকলন করে (এ পুস্তকটি স্বয়ং আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব নিজেই অনুবাদ করেছেন) বলেন, "উক্ত হাদিসটি ইমাম দারেকুতনী, ইবনুস সাকান, আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস, ইমাম সুবকী সহিহ বলেছেন, আল্লামা নীমাবী হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন। তাবরানী হাদিসটি সংকলন করেছেন ও ইবনুস সাকান সহিহ বলেছেন।"

দেখুন আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এই সত্যকে নিজেই অনুবাদ করে সে নিজেই সত্যকে ধামাচাপা দিয়েছেন। এখন দেখি গ্রহণযোগ্য ইমামগণ উক্ত হাদিস সম্পর্কে কী বলেছেন।

২. বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দীস মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.) তার "শরহে শিফা" এ বলেন-

رواه ابن خزيمة و البزار و الطبرانى و له شواهد حسنه- شرح الشفاء: ١٥٠\٢

"উক্ত হাদিসটি ইমাম ইবনে খোযায়মা, ইমাম বায্যার, ইমাম তাবরানী (রাহ.) ও অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। এ সমস্ত বর্ণনা থেকে হাদিসটি 'হাসান' হওয়ার সাক্ষ্য প্রমাণিত হয়।"[২]

শুধু তাই নয়, একটু সামনে অগ্রসর হয়ে মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.) আরো বলেন-

رواه الدارقطنى و غيره و صححه جماعة من ائمة الحديث

"ইমাম দারেকুতনীসহ অন্যান্য ইমামগণ উক্ত রেওয়ায়েতকে বর্ণনা করেছেন এবং এক জামাত ইমামগণ উক্ত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।"[৩]

তিনিআরো বলেন, عَنِ ابْنِ عُمَرَ وغَيْرِهِ مرفوعا -"বর্ণনাকারীর মাধ্যমে মারফু সূত্রে (যার সনদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে) বর্ণিত হয়েছে।[৪] তাই বুঝা গেল হাদিসটির আরো অনেক সনদ বা বর্ণনাকারী রয়েছেন।

৩. অপরদিকে শায়খ ইউসুফ নাবহানী (রাহ.) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন- -صححه جماعة من ائمة الحديث "এক জামাত ইমামগণ উক্ত হাদিসকে সহিহ বলে মেনে নিয়েছেন।"[৫] তিনি আরো বলেন, -و ابن السكن صححه - "ইমাম ইবনে সাকান (রাহ.) ও উক্ত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।[৬]

৪. ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রাহ.) তার الجوهر المنظم فى زيارة القبر الشريف النبوى المكرم এর ৪২ পৃষ্ঠায় বলেন- -صححه جماعة من ائمة الحديث- "এক জামাত ইমামগণ উক্ত হাদিসটি সহিহ বলেছেন।

৫. ইমাম কাস্তালানী (রাহ.) বলেন-

رواه عبد الحق فى احكامه الوسطى و فى الصغرى و سكت عنه و سكوته عن الحديث فيهما دليل على صحته-

[১]. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৫/২০৫পৃ. ক্রমিক/৩৭৯

[২]. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫০ পৃ. দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

[৩]. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫০ পৃ.

[৪]. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫১ পৃ.

[৫]. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : শাওয়াহিদুল হক্ব : ৭৭ পৃ.

[৬]. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : শাওয়াহিদুল হক্ব : ৭৭ পৃ.

"আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস (রাহ.) তাঁর দুটি গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেন, আর তিনি উক্ত হাদীসের বিষয়ে চুপ ছিলেন, আর তাঁর চুপ থাকা সহিহ হওয়ার উপরে দালালত করে।"[১]

৬. এর ব্যাখ্যায় ইমাম যুরকানী বলেন, تحققت و ثبتت- 'তার (কাস্তালানীর) এই তাহকীক দ্বারা হাদিসটি দৃঢ় বা শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছে।'[২]

৭. অপরদিকে ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী (রাহ.) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন, قال السبكى بقوله: بل حسن أوصحيح- "ইমাম সুবকী বলেন, উক্ত হাদিস 'হাসান' লিজাতিহী অথবা সহিহ লিগাইরিহী এর মর্যাদা রাখে।[৩]

৮. ইমাম যুরকানী (রাহ.) বলেন, ان ابن خزيمة صححه- "নিশ্চয়ই ইবনে খুযায়মা (রাহ.) উক্ত হাদিসটিকে সহিহ সূত্রে বর্ণনা করেন।"[৪]

৯. ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন (রহ.) বলেন وَهَذَا إِسْنَاد جيد -"উক্ত সনদটি শক্তিশালী।[৫]

১০. ইমাম নুরুদ্দীন সানাদী বলেন- رَوَاهُ الدارَقُطْنِي وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ- "ইমাম দারেকুতনী ও অন্যরা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আর মুহাদ্দিস আবদুল হক হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।"[৬]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা কী তাহলে গ্রহণযোগ্য ইমামদের কথা মানব নাকি আহলে হাদিস মোল্লা আলবানী ও তার অনুসারীদের কথা মানব? আপনারই বলুন।

হাদিস নং –২

যে ব্যক্তি আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো ঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৬৫-৪৬৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটিকে জাল প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস উক্ত হাদিসটিকে জাল বা বানোয়াট বলেননি।

حَدَّثَنِي رَجُل مِنْ آلِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: »مَنْ زَارَ قَبْرِي« أَوْ قَالَ: »مَنْ زَارَنِي كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللهُ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

"হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার রওযা যিয়ারত করবে, তার জন্য আমি শাফায়াতকারী এবং সাক্ষী হব। যে ব্যক্তি দুই হারামাঈন শরীফের মাঝে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে নিরাপত্তা সহ হাশরে উঠাবেন।"[৭]

উক্ত হাদিসটি দুটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তাই একটি সূত্র অপর সূত্রকে শক্তিশালী করেছে এবং 'হাসান' বলে বিবেচিত হয়েছে।

হাদিস নং -৩

যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার রওযা শরীফ জিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে ঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৬৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটিকে জাল প্রমাণ করার জন্য অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছেন। অবশেষে তা প্রমাণ করতে না পেরে মুরসাল বলে ক্ষান্ত হয়েছেন।

---

১. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ.
২. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ.
৩. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ.
৪. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ.
৫. ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন : আল-বদরুল মুনীর : ৬/২৯৬ পৃ.
৬. ইমাম নুররুদ্দীন সানাদী : হাশীয়াতুল সানাদী আ'লা সুনানে ইবনে মাযাহ: ২/২৬৮ পৃ.
৭ক. ইমাম তায়লসী : আল-মুসনাদ : ১/৬৬ পৃ : হাদিস : ৬৫, ইমাম বায়হাকী : আস সুনানে কোবরা : ৫/২৪৫ পৃ., ইমাম ওকাইলী : আদ-দ্বঈফাহ : ৪/৩৬২পৃ. ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান : ৬/৪৮পৃ. হাদিস :৩৮৫৭, ইমাম তকী উদ্দিন সুবকী : আস-সুনান : ১৫ পৃ., ইমাম কুস্ড়ালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া : ৪/৫৭১ পৃ. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ., ইমাম দারেকুতনী : আস সুনান : ১/২১৭ পৃ : হাদিস :২৬৬৮, আল্লামা কুস্তলানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া : ৩/১৮৪ পৃ., ইমাম তকি উদ্দিন সুবকী : সিফাউস সিকাম : ১৮ পৃ., মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫০ পৃ., কাযী আয়ায : শিফা শরীফ : ২/১০২ পৃ., ইমাম আবু ই'য়ালা : আল-মুসনাদ, আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২২৪ পৃ. হাদিস : ২৪৮৭, ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪১৯ পৃ. হাদিস : ১১২৫, ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন : আল-বদরুল মুনীর : ৬/২৯৮ পৃ. ইবনে আসাকির, ইত্তাহাফুল যায়েরাহ ওয়াতরাফাল মুকিম, ১/২৩পৃ.কেনানী, ইত্তেহাফুল খায়রাত, ৩/২৫৮পৃ.হাদিস:২৬৯১

আমাদের দাবী ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) সহ এক জামাত উসূলে হাদিস বিশারদগণের মতে 'সিকাহ রাবীর মুরসাল হাদিস গ্রহণযোগ্য'।[১]

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الْخَطَّابِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللهُ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

"হযরত খাত্তাবের বংশধরের এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার জিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে, আর যে ব্যক্তি মদীনায় বসবাস করে এবং দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যাবলম্বন করবে, আমি তার জন্য সাক্ষী ও সুপারিশকারী হব। আর যার ওফাত দুই হেরেমের কোন হেরেমে হবে সে হাশরে নিরাপদ লোকদের শামিল হবে।"[২]

হাদিস নং –৪

যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়া একমাত্র আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে আসবে কিয়ামতে তার জন্য আমি সুপারিশকারী হব ঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৬৭ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসকে জাল প্রমাণ করার অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি। উক্ত হাদিসটির একজন রাবী 'মুসলিম ইবনুল সালিম আল জুহায়নী' সম্পর্কে সে মন্তব্য করেছেন নাকি দুর্বল রাবী দেখুন উক্ত রাবী সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম ইবনুল হাইয়্যান (রাহ.) এর মতে এবং আরও অনেক মুহাদ্দিসের মতে উক্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " «مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَعْمَلُهُ حَاجَةً إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে যিয়ারতকারী হিসেবে আগমন করবে, আমার যিয়ারত ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজন তাকে ধাবিত করবে না, তার জন্য আমার দায়িত্ব হবে যে, আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করব।"[৩]

সনদ পর্যালোচনা ঃ ইমাম হাইসামী (রাহ.) এই সনদটি সর্ম্পকে বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ وَفِيهِ مَسْلَمَةُ بْنُ سَالِمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.-

"উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রাহ.) তাঁর মু'জামুল আওসাত ও কাবীরে বর্ণনা করেছেন। উক্ত সনদে 'মাসলামা বিন সালিম' তিনি দ্বঈফ বা দুর্বল।[৪] উক্ত রাবী দুর্বল হওয়া নিয়ে যেহেতু ইমামদের মাঝে মত-পার্থক্য দেখা দিয়েছে সেহেতু তাকে দুর্বল বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে ইমাম আবু দাউদ (রাহ.) তাকে গায়রে

---

[১].ক. মুফতী আমিনুল ইহসান : মিযানুল আখবার পৃ - ১৮
খ. আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মুকাদ্দাসাতুশ শায়খ ২৫ পৃষ্ঠা
গ. ইমাম সূয়তী : তাদরীবুর রাভী : ৮২ পৃ.
ঘ. ইমাম সাখাভী : ফতহুল মুগীসঃ ১/১৪০ পৃ

[২]ক. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৪৮৮ পৃঃ হাদিস : ৪১৫২ :
খ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৬/১৮০ পৃঃ
গ. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল, ৪/২৬২ পৃঃ রাভী নং : ৯৬৬৫ (উক্ত রাবীর আলোচনায়)
ঘ. খতিব তিবরিযী : মেশকাতুল মাসাবীহ : ২/৫১২ পৃ : হাদিস : ২৭৫৫
ঙ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ৫/৬৩৮ পৃ. হাদিস : ২৭৫৫
চ. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪১৯ পৃ. হাদিস : ১১২৫
ছ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২২৪ পৃ. হাদিস : ২৪৮৭

[৩]. ক. ইমাম তাবরানী : মুজামুল কবীর : ১২/২৯১পৃ.হাদিস : ১৩১৪৯, ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ৫/১৬পৃ., হাদিস, ৪৫৪৬, ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৪/২পৃ. হাদিসঃ ৫৮৪২, ইমাম দারেকুতনী : আস্-সুনান : ২/২৭৮ হাদিস, ইমাম তকিউদ্দিন সুবকী : সিফাউস সিকাম : ১৩ পৃ., ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/৯৬ : রাবী নং : ৮৯৬৪, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৮/৫০পৃ.ক্রমিক নং.৭৭০৫, জীবনী: মুসলিম বিন সালেম, ও তার অপর গ্রন্থ তালখিসুল হবির, ২/৫৬৯পৃ., ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী :আদ্দুরারুল মুনতাসিরাহ : ১/২৩৭ পৃ., ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪১৯ পৃ. হাদিস : ১১২৫, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৪২৬ পৃ. হাদিস নং-২৪৮৭, ইবনে নাজ্জার, আখবারে মদিনা, ১/১৫৫পৃ. নুরুদ্দীন সানাদী, হাশীয়ায়ে সানাদী আ'লা সুনানি ইবনে মাজাহ, ২/২৬৮পৃ. ইবনুল মুলাক্কিন, বদরুল মুনীর, ৬/২৯৮পৃ.খিলঈ, আল-সাবেঈ মিনাল খিলাআ'ত, ৫২পৃ. হাদিস, ৫২, ফাওয়াইদুল হাসান সিহাহ ওয়াল গারায়েব, ১/৬৯পৃ. হাদিসঃ৬৮, ও আল-ফাওয়াইদুল মুনতাক্বাত, ১/২২২পৃ. হাদিসঃ২৮৩,

[৪]. আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামী, ৪/২পৃ. হাদিস/৫৮৪২

সিকাহ বলেছেন।[1] অপরদিকে ইমাম হাইসামী (রাহ.) উক্ত রাবি সম্পর্কে বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَسْلَمَةُ بْنُ سَالِمٍ، وَقَالَ: مَسْلَمَةُ بْنُ سَالِمٍ، ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ

"ইমাম তাবরানী (রাহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আর উক্ত সনদে 'মাসলামা বিন সালেম' রাবি রয়েছেন ইমাম আবু দাউদ (রাহ.)তাকে কিছুটা দুর্বল বলেছেন, কিন্তু ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহ.) তাকে তাঁর সিকাহ গ্রন্থে সিকাহ রাবির অর্ন্তভুক্ত করেছেন।[2] ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রাহ.) বলেন তিনি সিকাহ ছিলেন।[3]

তাই তাকে সরাসরি দ্বঈফ বলা যাবে না। তাই উক্ত হাদিস সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতি (রাহ.) বলেন,

وصححه ابن السكن-

"ইমাম ইবনে সাকান (রাহ.) উক্ত হাদিসকে সহিহ বলেছেন।" (সুয়ূতি, আদ্দুররুল মুনতাসিরাহ ফি আহাদিসিল মুশতাহিরাহ, ১/২৩৭পৃ.)

ইমাম যুরকানী (রাহ.) বলেন- صححه ابن السكن

"ইমাম ইবনুস্-সাকান (রাহ.) নিম্নোক্ত সনদকে সহিহ বলেছেন।"[4]

---

১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৫/২৯ পৃষ্ঠা :

২. আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামী, ১/১৯৫পৃ. হাদিস, ৯৪৪

৩. যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/১০৪পৃষ্ঠা, ক্রমিক নং.৮৪৮৯

৪. ক. ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ৩/১৮৫ পৃ. মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত।

খ. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

সুন্নী আন্দোলনের কান্ডারী

সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহঃ)

- সালাহউদ্দিন আহমদ মামুন

সুফী সাধকদের শুভাগমনের মাধ্যমে উপমহাদেশে পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মনোনীত ধর্ম দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটেছে। আর এ মহান কর্তব্য পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন নায়েবে রাসূল বিশেষ করে প্রিয় নবীর পুতঃ পবিত্র বংশধরগণ অর্থাৎ আওলাদে রাসূল (দঃ)। তেমনি একজন হচ্ছেন প্রিয় নবীর বংশধর উপমহাদেশের প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক সুন্নীয়ত আন্দোলনের কান্ডারী 'মসলকে আ'লা হযরত' এর প্রচার প্রসারের অন্যতম পথিকৃত কুতুবুল আকতাব, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, হাদীয়ে দ্বীনো মিল্লাত, পেশোয়ায়ে আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহঃ)। তাঁর বংশ শাজরা অনুসারে রাসূল (দঃ) কে প্রথম, হযরত মা ফাতেমা (রাঃ) কে দ্বিতীয়, হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে তৃতীয় ও ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) কে চতুর্থ ধরে ২৫তম স্তরে হযরত সৈয়্যদ গফুর শাহ ওরফে কাপুর শাহ (রহঃ) ও ৩৯তম স্তরে হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহঃ)'র নাম পাওয়া যায়। হযরত কাপুর শাহ (রহঃ) সর্বপ্রথম দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বর্তমান সিরিকোট অঞ্চলে আসেন।*

পাকিস্তানের হাজারা প্রদেশের হরিপুর জেলায় আওলাদে রাসূল হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ সদর শাহ্ (রহঃ)'র ঔরসে ১৮৫৬ সালে (১২৭২ হিজরী) হযরত সিরিকোটি (রহঃ) জন্ম নেন। ** হযরত সিরিকোটি (রহঃ)'র পিতা মাতা উভয়ে ছিলেন প্রিয় নবীর অধঃস্তন বংশধর। অতি অল্প বয়সে কোরআনে হাফেজ হয়ে তিনি কোরআন হাদীস, ফিকাহ সহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৮৮০ সালে (১২৯৭ হিজরী) তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপরই তিনি বৈবাহিক জীবনে পদার্পন করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই দ্বীনের তাবলীগ ও রুটি রুজির সন্ধানে সূদুর দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমান। সেখানে তিনি ক্যাপটাউন, জাঞ্জিবার, ড্যানবার, মোম্বাসা প্রভৃতি শহরে বাণিজ্যের পাশাপাশি ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং ব্যাপক সফলতা অর্জন করেন। ডঃ ইব্রাহীম এম. মাহদীর লিখিত "A short History of Muslims in South Africa" ঐতিহাসিক গ্রন্থে সেখানকার শীর্ষ ইসলাম প্রচারক হিসেবে ভারতীয় ব্যবসায়ী সৈয়্যদ আহমদ পেশোয়ারীর নাম এসেছে। আর এই ব্যক্তিই হযরত সিরিকোটি (রহঃ)। যিনি আমাদের দেশে প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছে পেশোয়ারী সাহেবে নামে পরিচিত।

"A short History of Muslims in South Africa" গ্রন্থ সূত্রে আরো জানা যায় তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাপটাউন বন্দরে আফ্রিকার নবদীক্ষিত মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম নিজের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯১১ সালে জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। বর্তমানে ঐ মসজিদটি হযরত সিরিকোটি (রহঃ)'র এক ভাইয়ের বংশ ধরের হাতে পরিচালিত হচ্ছে।

* Local Govt. Act, Ref-15, Hazra 1871, Pakistan.
** হালাতে মাশওয়ানী, মুহাম্মদী স্টীম প্রেস, লাহোর, পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত, ১৯৩১ ইং।

১৯১২ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং তাঁর মহীয়সী ও বিদুষী সহধর্মীনী হযরত সৈয়্যদা খাতুন (রহঃ)'র অনুপ্রেরণায় গাউসে দাঁওরান হযরত খাজা আব্দুর রহমান চৌরভী (রহঃ)'র সান্নিধ্য লাভের আশায় হরিপুর গমন করেন। তিনি হরিপুর বাজারে একটি কাপড়ের দোকান দিলেন। আসা যাওয়ার পথেই হঠাৎ একদিন এক নূরানী চেহারার মানুষের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। দু'জন চোখাচোখি। সিরিকোটি (রহঃ) সালাম দিলেন ও চৌরভী (রহঃ) সালামের উত্তর দিলেন। চৌরভী (রহঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে চাঁদ পুরুষ, আপনি কোত্থেকে?" উত্তরে সিরিকোটি (রহঃ) বললেন, "গঙ্গর উপত্যাকা থেকে এসেছি"। আরো বললেন, তিনি হরিপুর বাজারে একটি কাপড়ের দোকান দিয়েছেন। চৌরভী (রহঃ) বললেন, "আমার কাছে কিছু লোকজন আসে,

আমি তাদেরকে বলবো যে, হরিপুর বাজারে আমার একটি কাপড়ের দোকান আছে, তারা যেন সেখানে যায়" । চৌরভী (রহঃ)'র এমন কথাবার্তায় সিরিকোটি (রহঃ) নিজেকেই হারিয়ে ফেলছিলেন। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হযরত কিসে এত ব্যস্ততা আপনার" ? উত্তর এলো, "এখানে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ কাজে হাত দিয়েছি" । তৎক্ষনাৎ সিরিকোটি (রহঃ) নিজের পকেট থেকে একশো রুপি বের করে দিলেন। চৌরভী (রহঃ) হাত তুলে দোয়া করলেন। ফয়ুজাত পাওয়া শুরু হলো। তিনি তাঁর পীর খাজা চৌরভী (রহঃ)'র দরবারে শরীয়ত ও তরীক্বতের এক বে-মেসাল খিদমত আনজাম দেন। পীরের লঙ্গরখানার জন্য লাকড়ির সমস্যা দেখা দিলে সিরিকোটি (রহঃ) সিরিকোটের পাহাড় থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে প্রায় ১১ মাইল দূরের চৌহর শরীফে নিজ কাঁধে করে নিয়ে আসতেন। এভাবে কোন বিরতি ছাড়া বহু বছর এ কঠিন দায়িত্বটি পালন করেন। একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী, আলেম, হাফেজ, ক্বারী অধিকন্তু নবী বংশের মর্যাদা সবকিছু ভুলে তিনি নিজের আমিত্ব বিনাশের এ কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজ মুর্শিদের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)'র সন্তুষ্টি অর্জন করেন এবং ত্বরীকতের আসল পুরস্কার বেলায়ত ও খেলাফত লাভে ধন্য হন।

সিরিকোটি (রহঃ) শুধু ইসলাম প্রচারক কিংবা ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন একজন দানবীরও। তিনি নিজ খরচে বহু মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি তিনি এতে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে দ্বীনি মিশন এগিয়ে নিতে তৎপর হন। এক সময় লাহোর শাহী জামে মসজিদের খতীবের ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য তিনি অনুমতি প্রার্থনা করেন তাঁর পীরের নিকট। কিন্তু পীর সাহেব তাঁকে অনুমতি দিলেন না। কারণ মরহুম খতীব সাহেবের একজন উপযুক্ত সাহেবজাদা উক্ত পদের জন্য আগ্রহী এবং হক্বদার ছিলেন। সিরিকোটি (রহঃ) একবার পাহাড় জঙ্গলে চলে যেতে চেয়েছিলেন একান্তে ইবাদত বন্দেগী করার জন্য। কিন্তু পীর সাহেব তাকে অনুমতি দিলেন না, বললেন ওভাবে একাকী আল্লাহকে ডাকার চেয়ে মানুষের ভীড়ে নিয়ে দ্বীনি খেদমত করা অনেক উত্তম। নির্দেশ এলো রেঙ্গুন যেতে। ১৯২০ সালে পীরের নির্দেশে বৌদ্ধ শাসিত রেঙ্গুনে পদার্পণ করলেন। মুসলিম অধ্যুষিত লাহোর শাহী জামে মসজিদের পরিবর্তে বৌদ্ধ শাসিত রেঙ্গুনের বাঙ্গালী মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব নেন। তিনি প্রথম কয়েক বছর ধরে চৌরভী (রহঃ)'র শানমান ও অলৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াজ নসীহত করতেন। ফলে শ্রোতাদের অনেকেই চৌরভী (রহঃ)'র হাতে বাইয়াত হবার আগ্রহ দেখায়। এ খবর সিরিকোটি (রহঃ) তাঁর পীর চৌরভী (রহঃ) কে জানানোর পর তিনি তাঁর একটি রুমাল রেঙ্গুনে পাঠান এবং বলেন, যারা সিরিকোটি (রহঃ)'র মাধ্যমে এ রুমাল ধরে মুরিদ হবেন তারা চৌরভী (রহঃ)'র মুরিদ হিসেবে গণ্য হবেন। অবশ্য এর কিছুদিন পর সিরিকোটি (রহঃ) তাঁর পীরের খেলাফত লাভ করেন এবং নিজের হাতে মুরীদ করা শুরু করেন।

১৯২৪ সালের ৫ই জুলাই হযরত খাজা আব্দুর রহমান চৌরভী (রহঃ) ইন্তেকাল করেন। পীর সাহেবের ইন্তেকালের খবর তাঁর আগাম জানা হয়ে গিয়েছিল বিধায় চেয়েছিলেন এই সময়ে পাশে থাকতে, কিন্তু অনুমতি মিলল না। বরং বলা হয়েছিল দরূদ শরীফ গ্রন্থ মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল (দঃ)'র কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রেঙ্গুন ছাড়া যাবে না। তাই তিনি পত্র লিখে পীর সাহেবকে তাঁর আকুতি মিনতি পেশ করেছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন- "ইঞ্জিন থেকে বগি আলাদা হয়ে গেলে বগির অবস্থা কি হবে" ? আর পীর সাহেব উত্তর দিলেন, "তুমি আমি হলে, আমি হলাম তুমি, আমি শরীর হলাম আর তুমি প্রাণ, কেউ আর না বলে যেন তুমি আর আমি পৃথক সত্ত্বা" । পীরের আশ্বাসে মুরিদের বিশ্বাস ও দৃঢ় আস্থাকে বাড়িয়ে যে কোন আসমানে নিয়ে যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পীরের নির্দেশ মানা ফরজে আইন একথা অনুধাবন ও বিশ্বাস করতেন বলে সিরিকোটি (রহঃ) দীর্ঘ দিন দেশে যাননি। এমনকি প্রিয় সন্তানের ইন্তেকালের খবর পেয়েও পীরের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে দেশে যাওয়া হয়নি।

মাযহাব ও মিল্লাতের কর্মকান্ড পরিচালনার্থে তিনি ১৯২৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী "আনজুমান এ শুরা এ রহমানিয়া, রেঙ্গুন" প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ১৯২৭

সালে হরিপুর রহমানিয়া মাদ্রাসার দ্বিতল ভবন নির্মিত হয়। সিরিকোটি (রহঃ)'র নেতৃত্বে চৌরভী (রহঃ)'র লিখিত বিশাল দরূদ গ্রন্থ মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল (দঃ) ছাপানোর মতো বিশাল খরচ সাধ্য সাহসী উদ্যোগ এই সংস্থার মাধ্যমে ১৯৩৩ সালে সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়। সিরিকোটি (রহঃ)-১৯৩৫/৩৬ সালের দিকে রেঙ্গুন থেকে সিরিকোট যাওয়া আসার পথে চট্টগ্রামে যাত্রা বিরতি করেন। এর মধ্যে দিয়ে এ আলোর মশাল বাংলাদেশের এই পূর্ব কোণে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি যাওয়া আসার পথে প্রায়ই চট্টগ্রামে নামতেন। ১৯৩৭ সালের ২৯শে আগস্ট আনজুমান এ শুরা এ রহমানিয়া, চট্টগ্রাম শাখা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে এর অফিসিয়াল যাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকেই তিনি রেঙ্গুন প্রবাসীদের রেঙ্গুন ছাড়ার পরামর্শ দেন এবং নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে নিয়ে যার যার দেশে যাবার পরামর্শ দেন। যেহেতু তাঁর কাছে এই অদৃশ্য সংবাদ ছিল যে, রেঙ্গুনের পতন অবশ্যম্ভাবী এমন কি দিন তারিখও তাঁর জানা ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন যে, রেঙ্গুনে ভয়াবহ বোমা হামলা হবে, জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হবে ও রেঙ্গুনের পতন ঘটবে। তাই পীরের প্রতি আস্থাভাজনরা ব্যবসা গুটিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে শুরু করে। ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে যে, ১৯৪১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সিরিকোটি (রহঃ)'র ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু মিলে গেল। এই দিন রেঙ্গুন শহর জাপানী বোমায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। যারা পীরের কথা বিশ্বাস করেনি বা লোভ সামলাতে পারেনি তা তাদের জন্য মৃত্যু ও সম্পদ হানির ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনল।

১৯৪২ সাল থেকে চট্টগ্রাম হয়ে উঠল হুজুর ক্বিবলার চূড়ান্ত ষ্টেশন যা আজো আলো ছড়াচ্ছে বিশ্বময়। চট্টগ্রামে অবস্থানকালে হুজুর ক্বিবলা প্রত্যন্ত অঞ্চলের ওয়াজ মাহফিলেও অংশ গ্রহণ করতেন। এরূপ ১৯৫০/৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাওলানা ইজহারুল হক সাহেবের উদ্যোগে ওয়াজ মাহফিলের দাওয়াতে তিনি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার শেখেরখীল গ্রামে সফর করেন। মাহফিলের শুরুতে দরূদ শরীফ পড়ার পবিত্র কুরআন পাকের নির্দেশক আয়াতে করীমা হুজুর ক্বিবলা পাঠ করেন। সফর সঙ্গী ছাড়া উপস্থিত কেউ দরূদ পড়লেন না দেখে হুজুর ক্বিবলা যুগপৎ বিস্মিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে তড়িঘড়ি করে শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সে রাতে এবং পরদিন পর্যন্ত কোন পানাহার করেননি। মুরিদদেরকে ডাকলেন ও নির্দেশ দিলেন, "এমন একটি জমি খোঁজ কর শহরও নয়, গ্রামও নয়। সাথে মসজিদ, পুকুর থাকা চাই" । অনেক খোঁজাখুজিঁর করে কয়েকটি জমি দেখানো হল শেষ পর্যন্ত ষোলশহরস্থ নাজির পাড়ায় অবস্থিত জমি পরিদর্শনে গেলে হুজুর ক্বিবলা আনন্দিত হয়ে এ স্থানটি পছন্দ করলেন এবং বললেন দ্বীনি শিক্ষার "খুশবু" পাওয়া যাচ্ছে এ জমি থেকে। ১৯৫৪ সালের এক শুভক্ষনে সে নির্ধারিত স্থানটিতে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা "জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া" র ভিত্তি সিরিকোটি (রহঃ)'র পবিত্র হস্ত মুবারক দ্বারা স্থাপিত হয়। তিনি বলেন, "এই জামেয়া হযরত নূহ (আঃ)'র কিসতি তুল্য" । এ মাদ্রাসার খেদমত যারা করবে তারা ঐ কিসতির যাত্রীদের মতো মুক্তি পাবে। মাদ্রাসা বাস্তবায়নের জন্য ২২শে জানুয়ারী ১৯৫৪ তে প্রতিষ্ঠিত হয় "আনজুমান এ আহমদিয়া সুন্নিয়া" ।

১৯৫২ সালে ঢাকার কায়েৎটুলী খানকাহ শরীফ প্রতিষ্ঠিত হয় হুজুরের হাতেই, সে থেকে এ পর্যন্ত এই খানকাহ শরীফটি শরীয়ত ও ত্বরিকতের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ১৯৫৬ সালের ১৮ই মার্চ "আনজুমান এ শুরা এ রহমানিয়া" ও "আনজুমান এ আহমদিয়া সুন্নিয়া" একত্রিত করে "আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া" নামকরন করেন। যা বর্তমান "আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাষ্ট" নামে পরিচিত। এই ট্রাষ্ট সমগ্র বাংলাদেশে সুন্নীয়তের জন্য আশা ভরসার প্রতীক হিসেবে সুবিদিত। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত হুজুর ক্বিবলা বাংলাদেশে আসা যাওয়া করেন। তিনি ১৯৪৫ ও ১৯৫৮ সালে জাহাজ যোগে হজ্বে যান। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৫ সালে হজ্বের সময় মদীনা মুনাওয়ারার তৎকালীন খাদেম মাওলানা সৈয়্যদ মঞ্জুর আহমদ রাসূল (দঃ) কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সিরিকোটি (রহঃ)'র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ সময় রাসূল (দঃ) কর্তৃক সিরিকোটি (রহঃ) এক রহস্যময় বাতেনী

নির্দেশ প্রাপ্ত হন যে, তিনি যেন পরবর্তী হজ্বে আসার সময় তাঁর বড় নাতি সাহেবজাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মাঃজিঃআঃ) কে সাথে করে মদীনায় নিয়ে আসেন এবং রাসূল (দঃ) এর সাথে মোলাকাত করিয়ে দিতে। ১৯৫৮ সালেই তাঁর জীবনে সেই সুযোগটি আসে এবং হযরত তাহের শাহ (মাঃজিঃআঃ) কে সাথে নিয়ে হজ্বে বাইতুল্লাহ্ ও জেয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা সম্পন্ন করেন। এ সময় ৯ই জিলহজ্ব আরাফাতের ময়দানে সিরিকোটি (রহঃ) তাঁর বড় নাতি তরুণ হাজী তাহের শাহ্ (মাঃজিঃআঃ) কে নিজ হাতে বাইয়াত করিয়ে সিলসিলাভুক্ত করেন এবং রাসূল (দঃ) এর কাছে সোর্পদ করেন।

১৯৫৮ সাল ছিলো সিরিকোটি (রহঃ)'র বাংলাদেশে শেষ সফর। এ বছরও হযরত তৈয়্যব শাহ্ (রহঃ) বাবার সাথে বাংলাদেশে আসেন। এ সফরেই চট্টগ্রামের রেয়াজুদ্দিন বাজারে মরহুম শেখ আফতাব উদ্দিন আহমদের কাপড়ের দোকান 'শেখ সৈয়দ ক্লথ ষ্টোরে' খতমে গাউসিয়া শরীফ চলাকালীন সময়ে সিরিকোটি (রহঃ) উপস্থিত সবাইকে চমকিয়ে দিয়ে আকস্মিক ভাবে ঘোষণা করেন, এইমাত্র হুকুম হলো তৈয়্যব শাহ কে খেলাফত দেওয়ার জন্য। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন যে, আমি দুনিয়ার আনাচে কানাচে খুঁজে বেড়িয়েছি এ দায়িত্ব কাকে চাপাব। কিন্তু উপযুক্ত কাউকে পেলাম না। অবশেষে হযরাতে কেরাম আমাকে আশ্বস্ত করলেন এবং তৈয়্যব শাহকে মনোনীত করলেন এ গুরু দায়িত্বের জন্য। সিরিকোটি (রহঃ) উপস্থিত মুরিদদের সামনে সাহেবজাদা তৈয়্যব শাহ্ (রহঃ) কে খেলাফত প্রদান করেন এবং খলিফায়ে আ'জম ঘোষণা করেন।

১৯৬১ সাল ১৩৮০ হিজরী ১লা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের দিন সকালে সিরিকোটি (রহঃ) সাহেবজাদা তৈয়্যব শাহ (রহঃ) কে ঈদের জামাতে ইমামতির নির্দেশ দিলে তৈয়্যব শাহ (রহঃ) বিস্মিত হন। কারণ, ইতিপূর্বে জুমা ও ঈদ জামাতের ইমামতি শুধু সিরিকোটি (রহঃ) করতেন। ঈদের জামাতে ইমামতির দায়িত্ব প্রদানের মধ্যে দিয়ে সিরিকোটি (রহঃ) তাঁর সাহেবজাদার উপর অর্পিত বিশাল দ্বীনি নেতৃত্বের অভিষেক করান। ঈদের নামাজের পর থেকে ১০ ই জিলক্বদ রাত পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ দিন সিরিকোটি (রহঃ) একমাত্র লাচ্ছি ছাড়া অন্য কোন প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করেননি। বলতেন, তাঁর চিরবিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এ চল্লিশ দিন তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে থাকেন সাহেবজাদা তৈয়্যব শাহ্ (রহঃ)। প্রকৃতপক্ষে এ চল্লিশ দিনে সিরিকোটি (রহঃ) তৈয়্যব শাহ (রহঃ)'র হাতে গাউসিয়াতের মহান দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। এভাবে চল্লিশতম দিবস ১০ই জিলক্বদ বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে শাহেনশাহ সিরিকোট (রহঃ) তাঁর শতোর্ধ্ব বছরের জাহেরী হায়াতের ইতি টানেন এবং পরদিন ১১ই জিলক্বদ জুমা দিবসে তাঁকে শায়িত করা হয়।

সিরিকোটি (রহঃ)'র অসংখ্য কারামত ও আধ্যাত্মিক জীবনের ঘটনাবলী যা আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান, রেঙ্গুন, বাংলাদেশ ও মক্কা-মদীনা শরীফে সংঘটিত হয়েছিল তার বিবরণ দেয়া এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। একবাক্যে শুধু এটাই বলা যায় যে, তিনি ছিলেন আউলিয়া সম্রাট কুতুবুল আকতাব। ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাজী আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁর "দীওয়ানে আজীজ" গ্রন্থে সিরিকোটি (রহঃ) সর্ম্পকে বলেন, "ওই জামানায় সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহঃ)'র তুলনা হয় এমন উঁচু স্তরের পীর আমি পৃথিবীর কোথাও দেখিনি" ।

তথ্যসূত্রঃ শাজারা শরীফ ও মাসিক তরজুমান, প্রকাশক- আনজুমান এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাষ্ট ।

অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ জলিল (রঃ) ছিলেন আমাদের ঈমানী পথের দিশারী

– মোহাম্মদ আবুল হাশেম

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার যিনি অজ্ঞানান্ধ মানুষের হেদায়তের জন্যে নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। দয়াল নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী-রাসূলদের মধ্যে সর্বশেষ। এরপর পৃথিবীতে আর কোন নবী ও রাসূলের আবির্ভাব হবে না। তিনি খাতেমুন নবী। দয়াল নবীজীর উম্মতদের মধ্যে আওলিয়ায়ে কেরাম এবং আলেম ওলামাগণ কেয়ামত পর্যন্ত মানুষকে হেদায়েত করতে থাকবেন। হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আওলিয়া ও ওলামাদের মর্যাদা বনী-ইসরাইলী নবীদের মর্যাদার মত। আওলিয়ায়ে কেরাম, আলেম-ওলামার সংখ্যা অসংখ্য ও অগণিত।

মানুষ যখন সংসারের মায়াময় বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ভুলে যায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কথা, ভুলে যায় আল্লাহকে এবং সত্যকে– তখন আল্লাহর পেয়ারা আলেম-ওলামাদের জীবনাদর্শই প্রজ্জ্বলিত করে তাদের সামনে হেদায়েতের আলো। সেই আলো সাধারণ মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে টেনে নিয়ে যায়। সুতরাং ওলি-আল্লাহদের মহান জীবনালেখ্যই সত্যিকার ইসলামের বাস্তব দৃষ্টান্ত। আর তাঁদের জীবনাদর্শকেই গ্রহণ করতে হবে আমাদের পথের দিশারীরূপে। একমাত্র তাতেই পেতে পারি আমরা 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীম' অর্থাৎ আল্লাহ-তা'য়ালার সরল ও সহজ পথ। তেমনি আমাদের মাঝে 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীম'-এর পথ দেখিয়ে গেছেন অধ্যক্ষ হাফেয মোহাম্মদ আবদুল জলিল (রহঃ)।

অধ্যক্ষ হাফেয এম. এ. জলিল (রহঃ)-এর জন্ম চাঁদপুর জেলার মতলব থানার পাঠান বাজার আমিয়াপুর গ্রামে। দিল্লীর প্রখ্যাত বুযুর্গ ও ফেকাহবিদ আলেম এবং বাদশাহ আলমগীরের ওস্তাদ হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ) ছিলেন তাঁর বংশের উর্দ্ধতন পুরুষ। তিনি পবিত্র কোরআন দু'বছর তিন মাসে হিফয শেষ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ছাত্র জীবন শেষ করে প্রথমে অধ্যাপনা এরপর ইমামতি– পরবর্তীতে খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। ইমামতির– ফাঁকে ফাঁকে অগ্রণী ব্যাংকে প্রভেশনারী অফিসার হিসেবে কাজ করে এক বছরের মধ্যেই ইস্তফা দেন। ১৯৭৩ইং সালে বিসিএস লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাজীগঞ্জ বড় মসজিদে ছয় মাস ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম চলে যান। চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে ১৯৭৭ সালে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৮৭ইং সাল থেকে ১৯৯০ইং পর্যন্ত মধ্যখানে ৪ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পুনরায় ১৯৯০ইং-এর ডিসেম্বরে মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মসজিদের খতিব, ওয়াজ-নসিহত ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নির্বাচিত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বুখারী শরীফসহ তাঁর লিখিত, অনুদিত ও সম্পাদিত ১৯ খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৯ইং সালে মাসিক পত্রিকা সুন্নীবার্তা আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন।

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল (রহঃ)-এর জীবন ও কর্ম লেখার মত দুঃসাহস আমার নেই। যেহেতু তাঁর ওফাত দিবস সেপ্টেম্বর মাসে। সেই হিসেবে হযরতুল আল্লামা মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন, খতীব এবং সুন্নীবার্তার সম্পাদক হিসেবে হুজুরের ওপর একটা লেখা লিখার জন্যে বলেছেন তাই চেষ্টা। অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল (রহঃ)-এর জীবনের ছোট বড় অনেক ঘটনা তাঁর নিজ মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কারণ হুজুরের প্রকাশনার বেশীর ভাগই আমাদের এইচ কে প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রণ করেছেন। সেই সুবাধে হুজুর মাঝে মাঝেই আমার অফিসে আসতেন। অনেক সময় আমার অফিসে বসেই প্রুফ দেখতেন। ফাঁকে ফাঁকে কথোপকথন হত। এছাড়া আজমীর শরীফে ২১ দিনের সফরসঙ্গী

ছিলাম আমি অধম। যে সফর শেষে "সফর নামায়ে আজমীর" পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়।

মাসিক সুন্নীবার্তা প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৯৯ইং সালে। এর একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে। মাওঃ দিল্লুর রহমান সাহেব আল-বায়েন্যাত নামে মাসিক একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। প্রথম দিকে সুন্নীয়তের ওপর বেশ লেখা-লেখি করে সুন্নীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে সুন্নীয়তের লেবেল এঁটে উল্টা-পাল্টা লেখা শুরু করেন। হুজুর খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, কিভাবে তার সময়োচিত জবাব দেয়া যায়। তিনি আমাদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং বললেন, তলোয়ার এর আঘাত তলোয়ার দিয়েই ফিরাতে হয়। পরামর্শকরা পরামর্শ দিলেন যে হুজুর আল-বায়্যেনানত-এর জবাব দিতে হলে আমাদেরকেও মাসিক পত্রিকা বের করতে হবে। তাহলেই উপযুক্ত জবাব দেয়া যাবে। তিনি সম্মতি জানালেন বটে– কিন্তু আর্থিক যোগান কিভাবে হবে তা নিয়ে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন। আমরা যারা হুজুরের কাছাকাছি ছিলাম সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিলাম। সেই থেকে 'মাসিক সুন্নীবার্তা'র প্রকাশনা যাত্রা শুরু হলো। বেশীরভাগ লেখা এবং প্রুফ দেখাসহ সব কাজ হুজুর একাই করতেন। আস্তে আস্তে বিভিন্ন লেখকের লেখা ছাপাতে শুরু হলো। মাঝে মাঝে অনিয়মিত প্রকাশিত হতো। ২/৩ মাস একত্রে প্রকাশিত হতো। এভাবে চড়াই-ওতরাই-এর মধ্য দিয়ে হাটি হাঁটি পা-পা করে সুন্নীবার্তা চলতে লাগলো। এরই মধ্যে ২০০৮ ইং সাল থেকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন হুজুর। অসুস্থতার মাঝেও সুন্নীবার্তার খোঁজ-খবর সবসময় রাখতেন। বর্তমান সম্পাদক সাহেবকে সুন্নীবার্তার পূর্ণ দায়িত্বভার কিভাবে দিয়েছেন তা আমরা হযরতুল আল্লামা মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন সাহেব-এর কাছ থেকে শুনেছি। হুজুর-এর জীবদ্দশায়ও বর্তমান খতিব সাহেব প্রশ্নোত্তর বিভাগসহ লেখা-লেখির দায়িত্ব পালন করেছেন।

হুজুর যখন বেশ অসুস্থ তখন এক শুক্রবার এ্যাম্বুলেন্সে করে মসজিদে আসেন এবং সকল মুসল্লীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, আমি আপনাদের মাঝে দু'টো জিনিস রেখে গেলাম একটি 'মাসিক সুন্নীবার্তা' আর অন্যটি 'মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ বখতিয়ারকে গাউছুল আযম জামে মসজিদের খতিব' হিসেবে। যা আপনারা সবাই জানেন। এই দু'টো জিনিস ছাড়া আরও মহা-মূল্যবান সম্পদ তিনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। খতিব হিসেবে বর্তমান সময়ের খ্যাতিমান আলেমদের মধ্যে একজন এবং দিন দিন যথেষ্ট প্রজ্ঞার পরিচয় দিচ্ছেন তিনি। তাঁর ওয়াজে আম-লোকদের পরিবর্তন হচ্ছে, রাসূল প্রেমে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দূর-দর্শিতা যে কত সুদূর তারই প্রমাণ রেখে গেছেন অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ জলিল (রহঃ)। তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, হযরতুল আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন সাহেবই গাউছুল আযম জামে মসজিদের মুসল্লীদের আকৃষ্ট করতে পারবেন, তাঁর ওয়াজ দ্বারা। তাই তিনি তাঁকে মনোনীত করেছিলেন।

শুধু তাই নয়, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ-এর মুখপত্র 'মাসিক সুন্নীবার্তা'র দায়িত্বও তাঁরই ওপর ন্যস্ত করে দিয়ে গেছেন হুজুর। যথেষ্ট ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও খতিব সাহেব দায়িত্ব এড়াতে পারছেন না। তিনি সুন্নীবার্তা যথাসময়ে প্রকাশনার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও অনেক সময় হয়ে উঠছে না। আমরা সবাই সর্বান্তকরণে সহযোগিতা করলে নিশ্চয়ই খতিব সাহেব হুজুর যথাসময়ে মানসম্পন্ন সুন্নীবার্তা উপহার দিতে পারবেন– আমার বিশ্বাস। অলি-আল্লাহগণ সাধারণ মানুষকে হেদায়েতের রাস্তা দেখিয়ে যান বেলায়েতের দ্বারা। হুজুরও আমাদের মাঝে সুন্নীবার্তাসহ বেশ কিছু আকায়েদের ধর্মীয় পুস্তক রেখে গেছেন। যা প্রতিটি ঘরে ঘরে থাকা দরকার এবং প্রতিদিনই হুজুরের কোন না কিতাব পড়া দরকার যার ফলে ঈমান মজবুত হবে। আর লেখার কলেবর বাড়িয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাইনা। অন্তরের অন্তস্থল থেকে হুজুরের রূহানী দোয়া কামনা করছি এবং ভুল-ত্রুটি ক্ষমা চাচ্ছি পাঠকদের নিকট। এবং আমরা যারা হুজুরের ভক্তবৃন্দ সবাই যেন হুজুরের আদর্শকে ধারণ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করতে পারি এ কামনা করছি। আমিন!

ইসলামের দৃষ্টিতে যৌতুক নেয়া হারাম

- সৈয়দা শারমীন আক্তার

যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক মারাত্মক অপরাধ। এটা মানবতা ও সমাজ বিরোধী কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি, নীতি বিবর্জিত একটি সামাজিক সমস্যা ও মানব সমাজে অমানবিক প্রথা। এ প্রথা ইসলাম সমর্থন করে না। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। যৌতুকের প্রতিশব্দ হলো পণ। এ শব্দ দুটি মূলত সংস্কৃত ভাষায়ই শব্দ। হিন্দি ভাষায় একে, দিহাজ, বলে। উর্দূ ও আরবীতে এতে, জাহীয, বলা হয়। স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে বিভিন্নি দেশে বিয়ের ক্ষেত্রে কনের পক্ষ থেকে বর পক্ষকে অর্থ, সম্পত্তি, উপঢৌকন উপহার সামগ্রী, অলংকার, আসবাবপত্র, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ইত্যাদি মূল্যবান সামগ্রী দেয়াকে বর্তমান সমাজে যৌতুক বুঝায়। বিয়ে উপলক্ষে বর পক্ষ দর কষাকষির মাধ্যমে কনে পক্ষের অভিভাবকের নিকট থেকে অধিক পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ও দ্রব্যসামগ্রী আদায় করা।

কখন যৌতুক প্রথার প্রচলন হয়েছে তার দিন, কাল সময় ও তারিখ নির্ধারণ করা না গেলেও জাহিলি যুগে যখন মেয়েদেরকে বোঝা মনে হতো তখন থেকেই এর একটা চাপা ধারণা সমাজে চলে আসছে। তবে মুসলিম সমাজে এর প্রচলন ছিল না। হিন্দু সামাজেই এর প্রচলন শুরু হয়। হিন্দু সমাজে কনে পক্ষের অভিভাবক বর পক্ষ বিয়ের সময় যৌতুকের মাধ্যমে যা প্রয়োজন তা আদায় করে নেয়।

বর্তমান সমাজে প্রচলিত যৌতুক প্রথা ইসলাম সমর্থন করে না, যৌতুক সমাজের একটি বোঝা স্বরূপ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঐ বিয়ে সর্বাধিক বরকতময় যে বিয়ে বোঝার দিক দিয়ে অধিক হালকা হয়, (বায়হাকী, ঈমান অধ্যায়)। ইসলামে যৌতুক নিষিদ্ধ হলেও বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে বাংলা পাক-ভারত উপমহাদেশে যৌতুকের কারণে আমাদের বাংলাদেশের বহু নারী বিয়ের পর বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার হয়। তবে যৌতুক ও উপহারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উপহার নিষিদ্ধ নয়। এতে তোমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে এবং শত্রুতা দূরীভূত হবে। (মোয়াত্তা ইমাম মালিক, হুসনুখুলক অধ্যায়)। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন "তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় কর, কারণ উপহার মনের ময়লা দূর করে" (তিরমীযী, হেবা অধ্যায়) সুতরাং বুঝা গেল যে, স্বত:স্ফুর্তচিত্তে খুশীমনে উপঢৌকন, উপহার, হাদিয়া আদান প্রদানে কোন দোষ নেই এবং কোন পাপও নেই। তবে দাবী করে, পণ করে বিয়ে উপলক্ষে জোর করে কিছু আদায় করা যৌতুকের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যৌতুক হল অন্যের অর্থ বা সম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া বিয়ে উপলক্ষে ভিন্ন কৌশল ও পন্থা অবলম্বন করে ভোগ করা। এভাবে যৌতুক ও পণ ইত্যাদি কৌশলে অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভোগ করো না। কিন্তু তোমরা পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ (আল কুরআন- ৪:২৯)। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কোন মানুষের জন্য তার ভাইয়ের সম্পদ খাওয়া বৈধ নয় তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে। বিয়ের সময় কনের জন্য মোহরানা ধার্য করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন" তোমরা ঐ নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীগণকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমরা স্বীয় স্বার্থেও বিনিময়ে তাদেরকে বিয়ে করতে চাও, এভাবেই তোমাদের পত্নী করে নাও শুধু কাম প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্য নয়। অতঃপর যে পন্থায় তোমরা তাদেরকে উপভোগ করবে যেন উক্ত নারী গণকে তাদের নির্ধারিত মোহর প্রদান কর। আর নির্ধারিত হওয়ার পর যে পরিমাণে তোমরা পরস্পর সম্মত হয়ে যাও তাতে কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়। (আল কুরআন- ৪:২৪)

সুতরাং উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, মোহর স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মেয়েদের ন্যায্য অধিকার থেকেও অনেকাংশ বঞ্চিত করা হচ্ছে। মোহর দেয়ার ওয়াদা থাকলেও তা দেয়না, বরং এ বিষয়টি উপেক্ষা করে উল্টো যৌতুক দাবী করা হচ্ছে, যা ইসলামে মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। যৌতুক দাবী ইসলামের প্রবর্তিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। নবীজী এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সম্মান লাভের জন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করে আল্লাহ তার অপদস্থতাই বাড়িয়ে দেন। আর যে তাকে সম্পদ লাভের আশায় বিয়ে করে আল্লাহ তার দারিদ্যতাই বাড়িয়ে দেন। আর যে তাকে বংশ গৌরব লাভের আশায় বিয়ে করে আল্লাহ তার অসম্মানই বাড়িয়ে দেন। আর যে তাকে দৃষ্টি অবনমিত রাখার জন্য অথবা নৈতিক চরিত্র ঠিক রাখার জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ে করে আল্লাহ তাকে সে স্ত্রীকে

বরকতময় করে দিবেন আর স্ত্রীর জন্যও তাকে বরকতময় বানিয়ে দেবেন। অর্থাৎ সবদিক থেকেই এ বিয়ে বরকতময় হবে।

যৌতুক শুধু ইসলামে নিষিদ্ধ নয়; বরং সামাজিক ভাবেও তা গর্হিত ও বর্জিত কাজ। আমাদের বাংলাদেশে বর পক্ষকে এ যৌতুক দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে নির্যাতনের শিকার হয়ে বহু নারীকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, অনেককে সংসার ছাড়তে হয়েছে, এমনকি যৌতুকের দাবী পূরণ করতে গিয়ে অনেক পরিবার নি:স্ব হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন পাশ হয়। এর পরেও যৌতুক প্রথা। আইনটি নিম্নরূপঃ-

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ ক. এই আইন ১৯৮০ সালের 'যৌতুক নিরোধ আইন' নামের অভিহিত হইবে। খ. সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দিষ্ট তারিখ হইতে ইহা বলবৎ হবে।

২. সংজ্ঞাঃ বিষয় বস্তু প্রসঙ্গেও পরিপন্থী না হলে এই আইনে, যৌতুক, বলতে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে প্রদত্ত যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বুঝাবে, যাঃ

ক) বিবাহের এক পক্ষ অপর পক্ষকে, অথবা

খ) বিবাহের কোন এক পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক, বিবাহের যে কোন পক্ষকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে বিবাহ মজলিশে অথবা বিবাহের পূর্বে বা পরে যে কোন সময়ে, বিবাহের পণ্যরূপে প্রদান করে বা প্রদান করতে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়; তবে যৌতুক বলতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরীয়ত) মোতাবেক ব্যবস্থিত দেনমোহর বা মোহরানা বুঝাইবে না। পত্র-পত্রিকা ও দেশের সমাজের বিয়ে-শাদীর মজলিসে ও বিয়ে সম্পর্কিত কর্মকান্ডের দিকে তাকালে যৌতুকের বিভিন্ন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু কারণ তুলে ধরা হল-

১. সমাজে সুশিক্ষার অভাব, বস্তুবাদী দৃষ্টি ভঙ্গি, পরকালে আল্লাহর জবাবদিহিতার ভয়ের শূন্যতা, ইসলামী ও নৈতিক জ্ঞানের অভাব, সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও জ্ঞানের অভাবই হল যৌতুক প্রথার অন্যতম কারণ।
২. নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ যৌতুকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।
৩. মেয়েদের বয়স সীমা অতিক্রম হয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেক সময় মেয়ের বাবা-মা বাধ্য হয়ে যৌতুক দেয়।
৪. উচ্চশিক্ষা, উচ্চবংশ, উচ্চবিত্ত পরিবারের পাত্র খুঁজতে গিয়ে তার চেয়ে নিম্নস্তরের মেয়েপক্ষ স্বেচ্ছায় যৌতুক দিয়ে থাকে। অনেক সময় মেয়েদের কম সৌন্দর্যের কারণে ছেলে পক্ষকে যৌতুক দিয়ে থাকে। আবার কোন কোন সময় দেখা যায় যে, কনে পক্ষ মেয়ের ভবিষ্যতের আশায়ও বরপক্ষকে যৌতুক গ্রহণের জন্য অনেকাংশে দায়ী।
৫. নারী শিক্ষার অভাব, যুবকদের বেকারত্ব, হীনমন্যতা, অন্য ধর্মের অনুকরণ ইত্যাদি যৌতুক গ্রহণের জন্য অনেকাংশে দায়ী।
৬. অনেকে আবার অর্থ লোভে কনে পক্ষের কাছে যৌতুক দাবী করে। *(চলবে)*

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর — আল্লাহু আকবার
নারায়ে রিসালাত — ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)

খানকা-এ-জলিলিয়া

"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ, রোড নং-২, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪

ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

খানকা-এ-জলিলিয়ায় প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হালকায়ে যিকির ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল পীরভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারী খানকায় উপস্থিত হয়ে এবাদত-বন্দেগী ও হুজুরের রূহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকী হাসিল করুন।

সালামান্তে

মোহাম্মদ আবদুর রব ও হুজুরের ভক্তবৃন্দ

প্রশ্নোত্তরে হজ্ব ও কুরবাণী

প্রশ্নঃ কোন কোন শর্ত পূরণ হলে একজন লোকের উপর হজ্জ ফরয হয়?

উত্তরঃ নিম্নবর্ণিত শর্তগুলোর সবকটি পূরণ হলে হজ্জ ফরয হয়:

১. মুসলমান হওয়া। অমুসলিম অবস্থায় কোন ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

২. বালেগ হওয়া।

৩. আকল-বুদ্ধি থাকা। অর্থাৎ অজ্ঞান ও পাগলের কোন ইবাদত হয় না।

৪. আর্থিক ও শারীরিক সক্ষমতা থাকা। আর্থিক সক্ষমতার অর্থ হলো হজ্জের খরচ বহন করার পর তার পরিবারের ভরণপোষণ চালিয়ে যাওয়ার মত সম্পদ ও সক্ষমতা থাকবে। শারীরিক সুস্থতার সাথে তার যানবাহনের সুবিধা, পথের নিরাপত্তা থাকা এবং মহিলা হলে তার সাথে মুহরাম পুরুষ থাকা এসবও সক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এর কোন একটিতে ব্যাঘাত ঘটলে হজ্জ ফরয হবে না।

প্রশ্নঃ যার উপর হজ্জ ফরয হয় তিনি কত দিন পর্যন্ত দেরী করতে পারেন ?

উত্তরঃ সাথে সাথেই হজ্জ আদায় করতে হবে। দেরি করা উচিত নয়। কারণ যে কোন সময় বিপদাপদ এমন কি মৃত্যু এসে যেতে পারে।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশ থেকে যারা উমরা ব হজ্জে যাবেন তারা কোন স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবেন?

উত্তরঃ 'ইয়ালামলাম' নামক স্থান থেকে। আকাশ পথে বিমান যখন উক্ত মীকাতে পৌঁছে তখন ক্যাপ্টেনের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়, তখনই ইহরাম বাঁধবে অর্থাৎ নিয়ত করবে। বাংলাদেশের বাড়ী কিংবা বিমান বন্দর থেকেও ইহরামের কাপড় পরে যাওয়া যায়। তবে নিয়ত করবেন 'মীকাতে' পৌঁছে বা এর পূর্বক্ষণে। মনে রাখতে হবে যে, ইহরাম বাঁধা ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা যাবে না। ইহরাম বাঁধার অর্থ হলো ইহরামের কাপড় পড়ে উমরা বা হজ্জের নিয়ত করা।

প্রশ্নঃ পুরুষের ইহরামের কাপড় কেমন হতে হবে ?

উত্তরঃ চাদরের মত দু'টুকরা কাপড় একটি নীচে পরবে, দ্বিতীয়টি গায়ে দিবে। কাপড়গুলো সেলাইবিহীন হতে হবে। পরিচ্ছন্ন ও সাদা রং হওয়া মুস্তাহাব। এ কাপড়ে সুগন্ধি লাগাবে না। লেগে গেলে ধুয়ে ফেলবে। ৩য় আর কোন প্রকার কাপড় গায়ে রাখা যাবে না। যেমন টুপি, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া কিছুই না। তবে শীত নিবারণের জন্য চাদর ও কম্বল ব্যবহার করতে পারবে।

প্রশ্নঃ মেয়েদের ইহরামের কাপড় কি ধরনের?

উত্তরঃ মেয়েদের ইহরামের জন্য বিশেষ কোন পোশাক নেই। মেয়েরা সাধারণত যে কাপড় পরে থাকে সেটাই তাদের ইহরাম। তারা নিজ ইচ্ছা মোতাবেক ঢিলেঢালা ও শালীন পোশাক পড়বে। তবে যেন পুরুষের পোশাকের মত না হয়। এটা কাল, সবুজ বা অন্য যে কোন রঙের হতে পারে।

প্রশ্নঃ ইহরামের ওয়াজিব কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ ৩টি (ক) মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

(খ) সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করা।

(গ) তালবিয়া পাঠ করা। অর্থাৎ নিয়ত করার পর তালবিয়া পাঠ করা ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ ইহরাম অবস্থায় মেয়েরা কি মুখ ঢেকে রাখতে ও হাত মোজা পরতে পারবে?

উত্তরঃ না। নিকাব ও হাতমোজা এ অবস্থায় পড়বে না। তবে ভিন্ন পুরুষ সামনে এলে মুখ আড়াল করে রাখবে। অর্থাৎ নিকাব ছাড়া ওড়না বা অন্যকোন কাপড় দ্বারা মুখমন্ডল ঢাকার অনুমতি আছে।

প্রশ্নঃ ইহরামের সময় হায়েয-নেফাসওয়ালী মেয়েরা কি করবে?

উত্তরঃ তারা পরিচ্ছন্ন হবে, গোসল করবে, ইহরাম পরবে। কিন্তু হায়েয- নেফাস অবস্থায় নামায পড়বে না এবং কা'বাঘর তাওয়াফ করবে না। বাকি অন্যসব কাজ করবে। এরপর যখন পবিত্র হবে তখন ওযূ-গোসল করে তাওয়াফ ও সাঈ করবে। যদি ইহরামের পর হায়েয শুরু হয় তখনো কা'বা তাওয়াফ করবে না যতক্ষণ পবিত্র না হয়।

প্রশ্নঃ নিয়ত কীভাবে করতে হয়?

উত্তরঃ নামাযসহ অন্যান্য সকল ইবাদাতের নিয়ত করতে হয় মনে ইচ্ছা পোষণ করে। মুখে উচ্চারণ করা লাগবে না। কিন্তু হজ্জ ও উমরার নিয়ত মনে মনেও করবেন এবং মুখেও উচ্চারণ করবেন।

প্রশ্নঃ ইহরামের পরে যে দু'রাক'আত নামায পড়া হয় তা কি উমরা ব হজ্জের নিয়তে ? নাকি তাহিয়্যাতুল ওযূর নিয়তে?

উত্তরঃ ঐ দু'রাক'আত নামায তাহিয়্যাতুল ওযূর নিয়তে পড়বেন। আর ফরজ নামায আদায়ের পর হলে স্বতন্ত্র আর কোন নামায পড়তে হবে না।

প্রশ্নঃ ইহরাম অবস্থায় যে সব কাজ নিষেধ এর কোন একটা কাজ যদি ভুলে বা না জেনে করে ফেলে তাহলে কি করতে হবে?

উত্তরঃ এ জন্য কোন দম বা ফিদইয়া দিতে হবে না। স্মরণ হওয়া মাত্র বা অবগত হওয়ার সাথে সাথেই এ কাজ থেকে বিরত হয়ে যাবে এবং এ জন্য ইস্তিগফার করবে। তবে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ ইহরাম অবস্থায় কি কি কাজ বৈধ?

উত্তরঃ (১) গোসল করতে পারবে। পরনের ইহরামের কাপড় বদলিয়ে আরেক জোড়া ইহরাম পরতে পারবে, ময়লা হলে কাপড় ধৌত করা যাবে।

(২) ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো, ফোঁড়া গালানো, দাঁত উঠানো ও অপারেশন করা যাবে।

(৩) মোরগ, ছাগল, গরু, উট ইত্যাদি জবাই করতে পারবে এবং পানিতে মাছ ধরতে পারবে।

(৪) মানুষের জন্য ক্ষতিকারক প্রাণী যেমন ঃ কুকুর, চিল, কাক, ইঁদুর, সাপ, বিচ্ছু, মশা, মাছি ও পিঁপড়া মারা যাবে। (নাসাঈ, ২৮৩৫)

পাঁচ ধরণের প্রাণীকে হারামে ইহরাম অবস্থায় হত্যা করলে হত্যাকারীর কোন গুনাহ হবে না। সেগুলো হলো -ইঁদুর, চিল, কাক, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর।

(৫) প্রয়োজন হলে আস্তে আস্তে শরীর চুলকানো যাবে।

(৬) বেল্ট, আংটি, ঘড়ি, চশমা পরতে পারবে।

(৭) সুগন্ধযুক্ত না হলে সুরমা ব্যবহার করা যাবে।

(৮) মেয়েরা সেলাইযুক্ত কাপড় পরতে পারবে এবং অলংকারও ব্যবহার করতে পারবে।

(৯) ইহরাম অবস্থায় পুরুষেরাও ছোটখাট সেলাই কাজ করতে পারবে।

(১০) কোমরের বেল্টে টাকা-পয়সা ও কাগজপত্র রাখতে পারবে।

(১১) ডাকাত বা ছিনতাইকারী দ্বারা আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার্থে আক্রমণকারীকে হত্যাও করা যাবে। আর নিজে নিহত হলে শহীদ হবে।

(১২) ইহরাম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে ইহরামের কোন ক্ষতি হয় না।

চলে গেলেন সুন্নি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা আল্লামা ছদরুল আমিন রেজভী

বাংলাদেশে সুন্নি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অতন্দ্র অগ্রসৈনিক মানবতাবাদী মানব হিতৈষি, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কেন্দ্রিয় সভাপতি, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন এর প্রেসিডিয়াম সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রেজভীয়া দরবার শরীফ-এর গদ্দিনসিন পীর আলহাজ্ব শাহ্ সূফী হযরাতুল আল্লামা ছদরুল আমিন রেজভী সুন্নি আল-কাদেরী আর নেই।

গত ১৬ আগষ্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁকে বহনকারী মাইক্রোবাস কিশোরগঞ্জ সদরস্থ নতুন জেলখানার মোড়ে পৌঁছলে একটি চলন্ত ট্রাকের সংগে মুখোমুখী সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। দরবার শরীফ সূত্রে জানা যায় দরবার শরীফের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, এতিমখানাসমূহের তদারকি এবং আল্লামা রেজভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর মাজার উন্নয়ন বিষয়ে সভা শেষে ধর্মিয় মাহফিলে যোগদানের লক্ষ্যে দরবার শরীফ থেকে কিশোরগঞ্জ হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাচ্ছিলেন। পারিবারিক জীবনে স্ত্রী সহ ২ ছেলে ৪ মেয়ে রেখে গেছেন। এ সড়ক দুর্ঘটনায় মাইক্রোবাস চালক ছাড়াও সফর সঙ্গী যারা আহত হন তারা হলেন ডাক্তার গোলাম মোস্তফা, রাকিবুল ইসলাম, আবু বকর, বুরহান উদ্দিন ও বিল্লাল হোসেন।

আলহাজ্ব শাহ্ সুফী ছদরুল আমিন রেজভী সুন্নি আন্দোলনের পথিকৃত, বাতিলের আতঙ্ক, মুনাজিরে আজম, গাজ্জালীয়ে জামান, অনলবর্ষী বক্তা, সুলেখক, কবি, মুফতিয়ে দ্বীন ও মিল্লাত, শের-ই-গাজী, ওস্তাজুল ওলামা, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত হযরাতুল আল্লামা আকবর আলী রেজভী সুন্নি আল কাদেরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং শ্রদ্ধেয়া তাপসী রাবেয়া আক্তার রেযার জ্যৈষ্ঠ সন্তান ছিলেন। ১৭ আগষ্ট বুধবার ৩টা ৩০ মিনিটে সতরস্ত্রী রেজভীয়া দরবার শরীফে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানাজা পরিচালনা করেন তাঁর জ্যৈষ্ঠ সন্তান আল্লামা বদরুল আমিন রেজভী।

নামাজে জানাজায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দ, তরিকত ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ নেত্রকোনা জেলার স্থানীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রাক্তন এম.পি. উপজেলা চেয়ারম্যান ছাড়াও সাড়া দেশ থেকে আগত ভক্ত মুরিদান সহ লক্ষাধিক লোক শরীক হন। এসময় স্থানীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে শান্তির ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে ওহাবী মওদুদীবাদ খারেজীদের ভ্রান্ত প্রচারনা ও জঙ্গীবাদের উত্থানের বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা পালনে ছদরুল আমিন রেজভীর কর্মময় জীবন ও অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে আলোচনা এবং স্মরণ করেন। জানাজা শেষে তাঁকে তাঁর পিতা আল্লামা আকবর আলী রেজভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাজার সংলগ্ন স্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী:

আলহাজ্ব আল্লামা ছদরুল আমিন রেজভী সুন্নি আল কাদেরী ১৯৫০ সালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গৌরিপুর থানার লংকা খোলা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শতাব্দীর মুজাদ্দিদ মুর্শিদে বরহক আল্লামা আকবর আলী রেজভী সুন্নি আল কাদেরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, মা শ্রদ্ধেয়া তাপসী রাবেয়া আক্তার রেজা।

নেত্রকোনা সরকারী কলেজ থেকে শিক্ষা শেষে পিতার নিকট থেকে কোরআন সুন্নাহর তালিম নেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই পিতার সন্তুষ্টি এবং খেলাফত লাভ করেন। পিতার উত্তরাধিকার এবং বড় সন্তান হিসেবে পিতার প্রতিষ্ঠিত রেজভীয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা, রেজভীয়া এতিমখানা রাবিয়া খাতুন মহিলা এতিমখানা সহ দরবারের হাল ধরেন। সম্পৃক্ত হন সুন্নি আন্দোলনে যা অব্যাহত ছিল জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত। শুধু তাই নয় মহান স্বাধীনতা যুদ্ধেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৭১ এর রনাঙ্গনের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়ে তাঁর অপরিসীম ত্যাগ চির স্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে।

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধকালে তাতিয়র মুজিব বাহিনী অস্থায়ী ক্যাম্পে আত্ম রক্ষামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে হায়দার জাহান চৌধুরীর অধীনে বিভিন্ন রণাঙ্গনে অংশ গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর পিতা আল্লামা আকবর আলী রেজভীকে পাক সেনারা ধরে ক্যাম্পে নিয়ে আসার পর তাঁর আধ্যাত্মিক

ক্ষমতার বলে পাক সেনাদের কবল থেকে মুক্তি পান। (বিজয়ের ৪০ বছর গ্রন্থ থেকে পৃঃ ২০৪)

ইসলামের নামে ইহুদিদের মদদপুষ্ট, মিথ্যাচারী, ওহাবী, মওদুদিবাদী খারেজী পন্থীরা এদেশের মুক্তিকামী জনগণ ও স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্তের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, আজো যা অব্যাহত রেখে জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটিয়েছে সেখানে এ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও তাঁর পরিবার মুক্তিবাহিনীতে সরাসরি অংশগ্রহণ ও ত্যাগ স্বীকার করে পবিত্র ধর্ম ইসলামের মর্যাদা দেশ ও বিশ্ববাসীর সামনে সমুন্নত রেখেছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের সরাসরি অংশগ্রহণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক মাইল ফলক। তাঁদের এ অংশগ্রহণ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নিরুপনের অনুপম মাপকাঠি। আর এ যুদ্ধের মধ্য দিয়েই প্রমানিত হয়েছে এজিদ পন্থী ওহাবী খারেজী মওদুদীবাদ চিরকালই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় মাহবুব আঁকা ও মাওলা নূর নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রবর্তিত শান্তির ধর্ম ইসলামের চির শত্রু।

যতদিন বাংলাদেশ থাকবে বাঙালি জাতি থাকবে ততদিন এদেশের হাজারো মুক্তিযোদ্ধার সাথে এ পরিবারের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষাও চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মানবতার ধর্ম ইসলামের সত্য ও শান্তির বাণী প্রচার ও প্রসারের এবং এ সত্য ধর্ম পালন ও লালনকারীদের মাঝে তিনি তাঁর পিতার মতই আদর্শ গুণাবলী নিয়ে স্রষ্টার বন্ধু হিসেবে আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে ছিলেন,আছেন এবং থাকবেন।

আল্লামা ছদরুল আমির রেজভী সুলেখক এবং প্রথিতযশা সম্পাদক হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলেন। সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন মাসিক আল-ঈমান সাময়িকির। দৈনিক সকালের দুনিয়া পত্রিকার উপদেষ্টা। তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে- 'নামাজ কী ও কেন' মুজেজায়ে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খানকা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি জামেয়া আহমদিয়া রেজভীয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা, আকবরীয়া ক্যাডেট মাদ্রাসা, শিমুল জানি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি। পরিজচালনা করেছেন রেজভীয়া এতিমখানা ও রাবিয়া খাতুন বালিকা এতমিখানা। তাছাড়াও জাড়িত ছিলেন সামাজিক কর্মকান্ড মানবতা শান্তির আদর্শে নিবেদিত প্রাণ এ মহা মহিম স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন অনেক পুরস্কার। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ধর্মীয় অঙ্গনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ সাপ্তাহিক বর্তমান সংলাপ এর ২৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ৩০ জানুয়ারী ২০১৬ তাঁকে ধর্মীয় অঙ্গনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ "প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ" হিসেবে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করেন।

আমরা শোকাহত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)-এর সভাপতি, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, তরিকত ফেডারেশনের প্রেসিডিয়াম সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রেজভীয়া দরবার শরীফ-এর গদিনশীন পীর আলহাজ্ব শাহ্ সূফি হযরতুল আল্লামা ছদরুল আমিন রেজভী সাহেবের ইন্তেকালে আমরা শোকাহত। তাঁর ইন্তেকালে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা বাংলাদেশের সর্বস্তরের সুন্নী মুসলমান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ একজন ভাল সংগঠক, কামেল পীর, সদালাপী ও একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে। যার ফলে সংগঠনে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং আল্লাহ যেন তাঁকে বেহেস্তের উচ্চ মাকামে স্থান দেন সেই দোয়া করছি।

হযরতুল আল্লামা ছদরুল আমিন রেজভীর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি রইল আমাদের সমবেদনা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ-এর নেতৃবৃন্দ ও সর্বস্তরের সুন্নী মুসলমান

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, ওস্তাজুল ওলামা,
শামছুল মাশায়েখ, শায়খুল ইসলাম

অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (রাঃ)

এর ৭তম পবিত্র

ওরস মোবারক

তারিখ :

২৩ সেপ্টেম্বর'১৬ইং,
রোজ-শুক্রবার (বা'দ মাগরিব)।

স্থান :
গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদ
শাহ্‌জাহানপুর, ঢাকা ।

আপনারা দলে দলে যোগদান করে হুজুর কিবলার রূহানী ফয়েজ বরকত হাসিল করুন।

ব্যবস্থাপনায় ঃ বাংলাদেশ যুবসেনা

গাউছুল আ'যম হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানা
গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ

গ্রামঃ সেকদী, ডাকঘরঃ বাগড়া বাজার, থানাঃ ফরিদগঞ্জ, জেলাঃ চাঁদপুর।

আবেদন

সম্মানীত অভিভাবকবৃন্দ
আস্‌সালামু আলাইকুম

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার অন্তর্গত সেকদী গ্রামে **হযরত বড়পীর গাউছুল আ'যম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাহঃ)**- এর স্মৃতিস্বরূপ **গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ, গাউছুল আ'যম হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও গাউছুল আ'যম এতিমখানা** নামে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূলতঃ সুন্নী আক্বিদা ভিত্তিক কোরআনে হাফিজ, ইসলামী জ্ঞানে পরিপূর্ণ আলেম গড়া ও প্রকৃত দরিদ্র এতিমের সাহায্য ও পূর্নবাসনের লক্ষ্যেই এই প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাই প্রতিষ্ঠাতার মূল লক্ষ্য।

বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

১। স্বল্প মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন ও স্বাস্থ্য সম্মত সুন্দর পরিবেশে থাকার-সু-ব্যবস্থা।
২। অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা বিশুদ্ধভাবে কোরআন মজিদ শিক্ষাদান।
৩। মেধাভিত্তিক বিশেষ বৃত্তি ও বিশেষ পুরুস্কারের ব্যবস্থা।
৪। প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন সুন্দর মসজিদ প্রতিষ্ঠিত।
৫। সার্বক্ষনিক বৈদ্যুতিক জেনারেটরের ব্যবস্থা।

ভর্তির যাবতীয় তথ্য ও ফরম সংগ্রহের জন্য মাদ্রাসা অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ঃ আলহাজ্ব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন

র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	২৫০.০০
া'লা হযরতের 'ইরফানে শরিয়ত'	১৩০.০০
শ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল	১২০.০০
তোয়ায়ে ছালাছীন বা ত্রিশ ফতোয়া	৮০.০০
াহকামুল মাযার	৮০.০০
শিয়া পরিচিতি	৬০.০০
মিলাদ ও কিয়ামের বিধান	৬০.০০
তোয়া ছালাছা	৩০.০০

কারামাতে গাউসুল আযম	৫০.০০
বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত	(নিঃশেষ
গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস	(নিঃশেষ
ফতোয়াউল হারামাঈন	(নিঃশেষ
সফর নামা আজমীর	(নিঃশেষ
ঈদে মিলাদুন্নবী ও না'ত লাহরী	(নিঃশেষ
মহাসমর কাব্যের ব্যাখ্যা	(পান্ডুলিপি

প্তি ঠিকানা ঃ খানকায়ে জলিলিয়া, ১৩২/৩ আহমদবাগ, (২য় লেন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯

দ্রঃ ৫০০০ টাকার পাইকারগণের জন্য ২০% কমিশন। ৫০০ টাকা হলে বিনা কমিশনে ভিপি করেও পাঠানো হয়।

সুন্নী মুবাল্লিগ ও সুন্নীবার্তার এজেন্সী ঠিকানা

গাহজাহানপুর গাউসুল
জামে মসজিদ, ঢাকা।

া জলিলিয়া দরবার কমপ্লেক্স
পুর, পাঠান বাজার মতলব,
।

ল আযম হাফেজিয়া মাদ্রাসা,
খানা ও জামে মসজিদ
, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

রিকত মাওঃ হেলাল উদ্দিন
ড়া নুরিয়া দরবার শরীফ
লিয়া, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।

াঙ্গুর মিয়া
য়া জামে মসজিদ, নদীর
ভৈরব বাজার, কিশোরগঞ্জ।

মোঃ নওশেরুজ্জামান
সিরাতুন্নবী দাখিল মাদ্রাসা,
গর, সাতক্ষীরা।

প্লাস
নসন, চকবাজার, কুমিল্লা।

গোলাম গাউস
তপুর দরবার শরিফ,
তুলপাই, কচুঁয়া, চাঁদপুর।

জু ডাঃ আনওয়ার হোসেন
পোঃ হাসিমপুর, রায়পুরা,
দী।

মাওলানা মুফতী ফারুক আহ্মেদ
সুপার, আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রা.) মহিলা মাদ্রাসা মতলব (উত্তর), চাঁদপুর।

পীরে তরিকত জামাল উদ্দিন মোমেন
কুতুবিয়া দরবার শরীফ, চৌধুরী বাড়ী, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

মুফতি এম.এ. তাহের
অধ্যক্ষ, আবেদনগর সুন্নিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, চাঁনগাঁও, লাকসাম, কুমিল্লা।

মোঃ এরফান শাহ (ফারুক)
সাং-ভরাট শিবপুর বড় পাটবাড়ী, পোঃ কাশিমপুর (দক্ষিণ), হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।

খড়িয়ালা দরবার শরীফ
আশুগঞ্জ ষ্টেশন রোড, বি-বাড়ীয়া।

মোহাম্মদ ফাহিম কাদেরী
খাজা হার্ডওয়ার ষ্টোর, টি আর রোড, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

মুন্সী আঃ শুক্কুর
খানকায়ে গাউছিয়া ইউএম.সি. পুরাতন কলোনী, নরসিংদী।

মাওলানা আবু সুফিয়ান আল-কাদেরী
কাদেরীয়া চিশতিয়া হোসাইনিয়া মাদ্রাসা বদরপুর, পো: হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।

আমজাদ হোসেন
হেলাল মাইক সার্ভিস, থানা: শাহজাদপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ।

মাওঃ আবুল কাসেম নূরী
রাণীখার, আখাউরা, বি-বাড়ীয়।

ডাঃ শহীদুল্লাহ্
উপশম হোমিও হল, শিবপুরবাজার, নরসিংদী।

মাওঃ শাহজাহান চিশ্‌তি
খতীব, তাতুয়াকান্দি মাজে মসজিদ, মঙ্গলের গাঁও, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

গাউসিয়া সোবহানিয়া দাঃ মাদ্রাসা
ডুমুরিয়া. কুচুয়া, চাঁদপুর।

মোশারফ হোসেন
চিশতী মেডিকেল হল
পীর কাশিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

মর্তুজা আলী
মর্তুজাষ্টোর চুনারুঘাট, জেলা: হবিগঞ্জ।

সুফী আলহাজ্ব খন্দকার মহিউদ্দীন
সুফী দরবার শরীফ, মহিষমারী, হোমনা, কুমিল্লা

হযরত শাহজালাল (র.) জামে মসজিদ
বারকাউনিয়া (বড় বাড়ী), তিতাস, কুমিল্লা।

সৈয়দ মতিউর রহমান আশরাফী
আঙ্গুয়াদী, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।

ডাঃ আবদুল মোতালেব চৌধুরী
নবীনগর পশুহাসপাতাল, বি-বাড়ীয়া

আলহাজ্ব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
খাদেমে তরিকত, তরিকায়ে মোজাদ্দেদিয়া কেন্দ্রীয় খানকা ও মাজার শরীফ, ৩১৩-পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

মোঃ আলি আশ্রাফ মজুমদার
নিজ মেহার (চৌধুরী বাড়ী), শাহরাস্তী, চাঁদপুর।

ডাঃ আবদুল করিম
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, পীরগাজর সাতক্ষীরা।

মো ঃ আজাদ মিয়া
মিরপুর, ঢাকা।